বঙ্কিমচন্দ্রের
নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ

কালজয়ী সৃষ্টি

বঙ্কিমচন্দ্রের
নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
সম্পাদিত

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

প্রথম প্রকাশ: 1993 (শক 1914)

প্রচ্ছদ: 1890 সালে অঙ্কিত বঙ্কিমচন্দ্রের তৈলচিত্র।
শিল্পী: রামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (1851-1932)
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা, কলকাতা

ISBN 81-237-0295-7

মূল্য: 32.00 টাকা

Bankimchandrer Nirbachito
Prabandho Sangraho *(Bengali)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক,
নয়াদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের মহান্ স্রষ্টা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম ২৬ জুন ১৮৩৮; মৃত্যু ৮ এপ্রিল ১৮৯৪) অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি শুধু ভারতীয় উপন্যাসের জনক বলেই নন—ঊনবিংশ শতকে ভারতভূমিতে আবির্ভূত শ্রেষ্ঠ চিন্তাধিনায়কদের মধ্যে তিনি এক অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন প্রধান পুরুষ। শুধু বঙ্গদেশের মানুষ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ তাঁর জীবৎকালপর্বেই এই সাহিত্যস্রষ্টার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শুধু ভারত-ভূখণ্ডেই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তাঁর সময়কালেই বহির্ভারতে ইংরেজিতে, জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের দূর প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের গভীর আগ্রহে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় ও বহির্ভারতীয় নানা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত সাহিত্যে এমন কোনো আবেদন নিশ্চয় আছে যা কেবল বঙ্গবাসী বা ভারতবাসী নয়—বিশ্ববাসীরও আকর্ষণ ও কৌতূহলী-আগ্রহের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে শতবর্ষকালব্যাপী। লণ্ডন থেকে ১৮৮৪ সালে ইংরেজি ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাস *The Poison Tree* প্রকাশিত হয়েছিল—অভারতীয় ভাষায় প্রথম অনূদিত তাঁর এই উপন্যাস; আর ১৯৮৫ সালে ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত আনন্দমঠ উপন্যাসের ফরাসী তর্জমা *Le Monastére de la Félicité* গ্রন্থ পাশ্চাত্যদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আগ্রহ ও বঙ্কিমসাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রে শতবর্ষপূর্তির এক উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছে। এই বিশ্ববরেণ্য মানুষটির প্রতি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল মানুষের আগ্রহ সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। বৎসরের প্রতিটি দিন প্রত্যুষে বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে যে বন্দেমাতরম্ সংগীত শ্রবণ করে ভারতের কোটি কোটি মানুষ রাত্রির নিদ্রা থেকে প্রভাতের আলোয় জেগে উঠেছে, সেই মন্ত্রের মহান্ স্রষ্টার প্রতি সমগ্র ভারতবাসীর গভীর জিজ্ঞাসা প্রত্যাশিত। ভারতের বিদ্বোৎসমাজের কর্তব্য জিজ্ঞাসু দেশবাসীর জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া। বঙ্কিমচন্দ্রকে জানার শ্রেষ্ঠ উপায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসসমূহে ও প্রবন্ধাবলীতে যে গভীর সংবেদনশীল মানবিক বাণী প্রচার করে গেছেন, যে ধ্যান-ধারণা চিন্তা-ভাবনার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে তার মূল্য তাৎপর্য যৌক্তিকতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুভূত হয়।

বর্তমান সংকলনটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর একটি নির্বাচিত সংগ্রহ। নানা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যবান চিন্তাভাবনার প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবন্ধগুলি নির্বাচন করতে প্রয়াসী হওয়া গেছে এখানে। তবে স্বভাবতই তাঁর বৃহত্তম প্রবন্ধসংগ্রহ গ্রন্থ 'বিবিধ প্রবন্ধ' দুটি খণ্ড থেকে অধিকাংশ প্রবন্ধ নির্বাচিত।

এই সংগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাগুলি সাময়িকপত্রে প্রকাশকালের ক্রম অনুসারে সন্নিবেশিত। এইরূপ কালক্রমানুসারে সংকলনের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ও ভাবনার জগতের মোটামুটি একটা ধারাবাহিক রেখাচিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মনে করি।

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদকীয়-নিবন্ধ 'পত্রসূচনা' লেখেন। বস্তুত এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রথম বাংলা প্রবন্ধ। এর পূর্বে তিনি তিনটি বাংলা উপন্যাস রচনা করলেও বাংলা প্রবন্ধ লেখার সূচনা বঙ্গদর্শনের পাতাতেই সর্বপ্রথম। 'পত্রসূচনা' রচনার কুড়ি বছর পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থে উক্ত প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা' শিরোনামে সংকলন করেন এবং প্রবন্ধের পাদটীকায় লেখেন 'এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিবার কারণ এই, ইহার মধ্যে যে সকল কথা আছে, তাহার পুনরুক্তি এখনও প্রয়োজনীয়।' আমরা শতাধিক বৎসর পরে বলি এখনও প্রয়োজনীয়। শুধু এই প্রবন্ধ নয়, আমাদের নির্বাচিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল প্রবন্ধ সম্পর্কেই এই বক্তব্য প্রযোজ্য।

বর্তমান কালে বঙ্কিমচন্দ্রের শুধু প্রাসঙ্গিকতা নয়, তাঁর প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ভারতীয় পাঠকসমাজকে আর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বঙ্গবাসী বঙ্গভাষী বাঙালী। তাঁর বিভিন্ন রচনায় সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনার পরিচয় থাকলেও তিনি মুখ্যত বঙ্গপ্রদেশের কথাই তাঁর রচনায় বিশেষভাবে উত্থাপন ও বিশ্লেষণ করেছেন—এ কথা সত্য। কিন্তু বঙ্গদেশের উন্নতির জন্য তিনি সেদিন যা ভেবেছিলেন এবং বলেছিলেন তা আজ ভারতের সকল প্রদেশের উন্নতির জন্য তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গলের ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রযোজ্য। দীর্ঘকালব্যাপী সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এমন কিছু কিছু গুরুতর সমস্যা রয়েছে যা একই সঙ্গে বঙ্গদেশের সমস্যা আবার বহির্বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সমস্যা। বঙ্কিমচন্দ্র এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর গভীর চিন্তাপ্রসূত যে-সকল পথনির্দেশ করে গেছেন, সেইসব পথ আজও আমাদের পক্ষে পরম মঙ্গলকর ও কল্যাণকর এবং সেই সকল পথ আজও আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত কারণে অতিশয় বরণীয় এবং অনুসরণযোগ্য।

'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের ভাষাসমস্যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত, ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষাগুলির প্রয়োগ ও সমৃদ্ধি ঘটাতে হবে এবং বিভিন্ন প্রদেশের মিলনভূমি রচনায় তথা বহিপ্রাদেশিক বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাকে অবলম্বন করতে হবে। সমগ্র

ভারতবর্ষের জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করে গিয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই।' এমন অনেক কথা আছে যা কেবল পৃথকভাবে বাঙালী, মহারাষ্ট্রী বা পাঞ্জাবীর জন্য নয়, সমস্ত ভারতবর্ষ তার শ্রোতা হওয়া প্রয়োজন—সেখানে অনিবার্যভাবে ইংরাজি ভাষা আবশ্যক। কিন্তু একথাও বঙ্কিমচন্দ্র তখনই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে দেশের সাধারণ মানুষের উন্নতি তথা দেশের মঙ্গল মাতৃভাষা ব্যতীত কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ 'সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না।' তাঁর মতে যে-কথা দেশের সাধারণ লোক বোঝে না বা শোনে না, সে কথায় দেশের সামাজিক উন্নতির সম্ভাবনা নেই।

বিদেশীয় ইতিহাসবেত্তাদের অভিমত ভারতবর্ষের এতকালের পরাধীনতার কারণ ভারতবর্ষীয়েরা দুর্বল কাপুরুষ ও হীনবল। বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা এই 'ভারত-কলঙ্ক' কি যথার্থ? প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন ভারতের এতকালের পরাধীনতার কারণ ভারতবাসীর তথাকথিত কাপুরুষতা বা দুর্বলতা কখনই নয়। তার প্রধান কারণ তাঁর মতে দুটি। 'প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারহিত।' দ্বিতীয় কারণ, 'হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব।' এইখানে আমরা দেখব জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কোনো বিশেষ দেশ জাতি বা ধর্মের সীমানা অতিক্রম করে উদার বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। কোনো দেশে জাতিপ্রতিষ্ঠার মূলে প্রথমে থাকে আত্মমঙ্গলচিন্তা। স্বজাতিয়েরা সেই সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়। জাতিপ্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় স্তরে পৃথিবীর ভিন্ন জাতির প্রতি সুতীব্র বিদ্বেষভাব ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের পাদটীকায় পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।' পরজাতির অমঙ্গল কামনা জাতি-প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় লক্ষণ। 'পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।'

জাতি-প্রতিষ্ঠার মূলে এই যে দুটি স্তর এ-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত মনোভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্কিম বলেন, 'এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্যে অনেক বার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে।' আধুনিক ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাঙালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী,

মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি বহু জাতি। এদের পরস্পরের মধ্যে নিবিড় ঐক্যের অভাব ভারতবর্ষে জাতিপ্রতিষ্ঠার বাধার বড় কারণ। এই যে বিভিন্ন জাতি 'ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই।' এই অনৈক্যই ভারতবর্ষের দুর্বলতার বড় কারণ। অথচ ঐক্যে সাফল্য অনিবার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর বিশ্বাস 'সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?' এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আকাঙ্ক্ষা সমগ্র ভারত জুড়ে জাতীয় ঐক্য সম্পাদন; আর তাঁর শেষ আকাঙ্ক্ষা সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বিদ্বেষভাব বিরোহিত মানবজাতির মিলনসাধন।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি, জমিদার, প্রাকৃতিক নিয়ম, এবং আইন—এই চার পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ 'বঙ্গদেশের কৃষক' বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা মহামূল্যবান একটি প্রবন্ধ-সমীক্ষা—এক ঐতিহাসিক দলিল। একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টা হয়ে দেশের কৃষকসমাজের কথা এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত অপর কেউ ভেবেছেন কি না জানি না। যদিও দেশের আজ অনেক পরিবর্তন ও সমৃদ্ধি ঘটেছে, যদিও এ-প্রবন্ধ অনেক কাল পূর্বে ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিরচিত, তথাপি এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল বিষয়ে আলোচনা করেছেন তা আজও ভারতবর্ষের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের পাঠ করা প্রয়োজন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার কাজে উদ্যোগী হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের উল্লেখ করেছেন—তারা শুধু যে বঙ্গদেশেরই কৃষকমাত্র তা তো নয়—তারা সমগ্র ভারতবর্ষেরই দরিদ্র কৃষকসমাজের জ্বলন্ত প্রতিনিধি। আমরা শিক্ষিতসমাজ, বণিক, মহাজন, বুদ্ধিজীবী, চাকুরিজীবী নানা সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে প্রসন্নচিত্তে বলি দেশের অনেক মঙ্গল হয়েছে, অনেক সমৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তখনই তীব্র শাণিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে বলেছেন, 'দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।' ভারতবর্ষ আজও কৃষিজীবীপ্রধান দেশ। কৃষিজীবীদের সম্পর্কে ভাববার মত, চিন্তা-উদ্রেককারী অনেক মূল্যবান বক্তব্য আজও এই প্রবন্ধের মধ্য থেকে আমরা সংগ্রহ করতে পারি।

প্রাচীন স্বাধীন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অবস্থার সঙ্গে উনিশ শতকের ইংরেজ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থার তুলনামূলক বিচার করেছেন 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র। লেখকের জিজ্ঞাসা, 'আধুনিক ভারতবর্ষে

দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর ?' প্রাচীন ভারতবর্ষের শূদ্রপীড়ক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষমা করেন নি। তাঁর মতে দেশের প্রকৃত 'স্বাধীনতা' দেশের অধিক সংখ্যক সাধারণ মানুষের সুখের উপরেই নির্ভর করে—দেশের রাজা স্বদেশী না পরদেশী তার উপরে নয়। দেশের শাসক ভিন দেশী না স্বদেশবাসী—তার ওপর দেশের স্বতন্ত্রতা বা পরতন্ত্রতা নির্ভর করতে পারে; কিন্তু দেশের স্বাধীনতা বা পরাধীনতা নির্ভর করে দেশের সাধারণ মানুষ সুখী না দুঃখী তার উপর। বঙ্কিমচন্দ্র এ-কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি যে ব্রাহ্মণ শাসিত তথা নিপীড়িত শূদ্র সম্প্রদায়, অর্থাৎ সংখ্যাগুরু ভারতবাসী প্রাচীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার সুখ ভোগ করেন নি। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ যে অর্থে পরাধীন ব্রাহ্মণ শাসিত প্রাচীন ভারতবর্ষও সেই অর্থেই পরাধীন। বঙ্কিমচন্দ্রের এ-কথা বলতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই যে—ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতে ইংরেজ ছিলেন। জনসাধারণের প্রকৃত সুখ-দুঃখের নিরিখে বঙ্কিমচন্দ্র শূদ্রপীড়ক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শাসিত ভারতবর্ষকে পরাধীন আর পরজাতিপীড়নশূন্য মহামতি আকবর শাসিত ভারতবর্ষকে যথার্থ স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন।

Personal essay বা ব্যক্তিগত অনুভূতিমূলক রচনা 'একা'। এই প্রবন্ধের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যে প্রীতি বিষয়ে যে-কথা বলেছেন সে-কথা তাঁর সমগ্র সাহিত্যের প্রধান বাণী প্রধান সুর বলে অভিহিত করা যায়। তাঁর আকাঙ্ক্ষিত শেষ সুখ হিন্দু প্রীতিতে নয়, বাঙালী প্রীতিতে নয়, ভারত প্রীতিতে নয়, স্থান-কাল-পাত্রের বেড়াজালে বদ্ধ কোনো সংকীর্ণ মানবগোষ্ঠীর প্রতি প্রীতিতে নয়; তাঁর প্রকৃত সুখ সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর উদার অনন্ত প্রেমানুভূতিতে। এমন মানুষই জগতের বুকে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারেন—'প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।' তিনিই বলতে পারেন—'মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।' এই প্রীতির বন্ধন ও তার বিস্তার সাধারণ মানুষের পক্ষে কেমন করে সম্ভব! এ-বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র সরল পথনির্দেশ করে গেছেন। ১৮৭৩ সালে 'একা' নিবন্ধে তিনি যে-কথা বলেছেন তারই আরও বিস্তারিত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখি এক যুগ পরে ১৮৮৫ সালে 'প্রীতি' শীর্ষক একটি নিবন্ধে। রচনাটি 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের অন্তর্গত। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মনুষ্যে প্রীতিই ধর্ম, তা-ই ঈশ্বর। যথার্থ ধার্মিকের পক্ষে পারিবারিক জীবন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বঙ্কিমের মতে 'পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না, যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি।... পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে স্ফুরিত হইলে পরিবারের বাহিরেও বিস্তার কামনা করে।... যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তারিত হয়, তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। হইলে, ইহা জাতিবিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়।' এই উক্তির সঙ্গে তিনি এ-কথাও স্মরণ

করিয়ে দিয়েছেন যে, 'দেশবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তির স্ফূর্তির চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম। যত দিন প্রীতির জগৎপরিমিত স্ফূর্তি না হইল, তত দিন প্রীতিও অসম্পূর্ণ—ধর্মও অসম্পূর্ণ।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক বঙ্গানুরাগ তাঁর ভারত-অনুরাগ তথা জগৎব্যাপী মানব-অনুরাগে পৌঁছানোর সোপান রূপেই বিবেচ্য।

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্যের বাহুল্যের কারণ নির্দেশ করেছেন এবং বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদের অন্তঃপ্রকৃতির কবি ও বহিঃপ্রকৃতির কবি—এই দুই ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাঁদের কবিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল।' সেই সূত্রে বঙ্কিম 'ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি' নির্ণয় করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জাতীয় চরিত্রের ফল জাতীয় সাহিত্য। তাই রামায়ণ সৃষ্টির পরে মহাভারতের আবির্ভাব, তার পরে ভক্তিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র, তার পরে পুরাণ, এবং ক্রমে 'কালিদাসাদির কাব্যনাটকাদি'র উন্মেষ। জাতীয় জীবনের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যেরও রূপ-বদল এবং পালা-বদল ঘটেছে।

'বাঙালীর বাহুবল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা একান্তভাবেই যে শুধু বাঙালীকে নিয়ে তা কিন্তু নয়। তাঁর মূল চিন্তা সর্বদাই বৃহত্তর ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করেই বিচরণ করেছে। এই প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, 'শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র।' আবার বলেছেন, 'বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে কাহারও উন্নতি হয় না।... তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ঘটে।' একটা জাতির বাহুবলকে কেবল তার শারীরিক বলের উপর নির্ভর করে পরিমাপ করতে চান নি বঙ্কিম। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট উক্তি—'শারীরিক বল বাহুবল নহে।' বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যবান মন্তব্য, 'উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে।' এই 'বাহুবলে' শুধু বাঙালী কেন, ভারতের সকল প্রদেশের মানুষই বলশালী হয়ে উঠতে পারে—গড়ে উঠতে পারে দুর্বলতার কলঙ্কমুক্ত নতুন এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আধুনিক ভারতবর্ষ।

'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত ধর্মের সার কথা পাঠককে বোঝাতে চেয়েছেন। এ ধর্ম একান্তভাবে মুসলমানের নয়, হিন্দুর নয়, বৌদ্ধ জৈন বা খ্রীষ্টানের নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিধাহীন স্পষ্ট উচ্চারণ—'ধর্ম্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম্ম এক।' 'পরের অনিষ্ট করিও না, সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও'—তাঁর মতে,

'এই মহতী উক্তি জগতীয় তাবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রের একমাত্র মূল, এবং একমাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে।' এবং 'প্রেম এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ। সর্ব্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্মনাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম্ম যতদিন না সার্ব্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, তত দিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।'

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সত্যের স্বরূপ নির্ধারণেও প্রয়াসী হয়েছেন। বস্তুত লেখকের এই প্রয়াস তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী। যে সত্যপালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট সে সত্য পালনীয় নয়। তাঁর কাছে সত্য কোনো অধরা আইডিয়া মাত্র নয়; মঙ্গল ও কল্যাণের সঙ্গে তাঁর সত্যভাবনা জড়িত।

তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বিড়াল'। পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য, তাদের স্বপক্ষে, তাদের অনুকূলে এমন তীব্রতম সফল সাহিত্যসৃষ্টি ভারতীয় সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে আর কেউ করেছেন কি না জানি না। কমলাকান্ত এই নিবন্ধে যেন সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, আর চতুষ্পদ ওই ক্ষুধার্ত 'আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গূল বিনত' মার্জারটি শুধু বঙ্গের নয় ভারতবর্ষের নয়—সমস্ত পৃথিবীর দরিদ্র অবহেলিত ক্ষুধার্ত মানবসম্প্রদায়ের মুখপাত্র। এই নিবন্ধে বঙ্কিম আইনের বিচার অপেক্ষা মানবিক মূল্যবোধের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আদালতের আইন সমাজের বাইরে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সক্ষম হতে পারে, কিন্তু একটা দেশের প্রকৃত মঙ্গল কেবল তার আইনের শাসনের উপর নির্ভর করে দাঁড়াতে পারে না। আদালত চোরের শাস্তি বিধান করে, কিন্তু চোর কেন চুরি করে আদালত তার অনুসন্ধান করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের সুস্পষ্ট অভিমত, 'অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী।' সমাজকে নূতন চোখে দেখার বিচার করার আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ 'চন্দ্রলোক'। এটি তাঁর 'বিজ্ঞানরহস্য' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত। বইয়ের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলেন শুধু সাধারণ পাঠকবর্গই নয়—'আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী' যাতে 'বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল' বুঝতে পারেন—'লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই।' স্ত্রীলোকেরও যে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রয়োজন বঙ্কিম তা উনিশ শতকের বাঙলা দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে অনুভব করে গিয়েছিলেন।

উনিশ শতকে রচিত তুলনামূলক সাহিত্যসমালোচনার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা'।

ভারতীয় সাহিত্যে 'সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।' কেন আর্যসাহিত্যে দ্রৌপদী সম্পূর্ণ একক এবং স্বতন্ত্র—'দ্রৌপদী' প্রবন্ধে উক্ত চরিত্রের বিশ্লেষণ সূত্রে এই প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই প্রবন্ধের দশ বছর পরে এর 'দ্বিতীয় প্রস্তাব' লিখিত।

আমাদের দেশে স্ত্রী-পুরুষে অধিকারগত এমন দুস্তর বৈষম্য কেন—এই জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হয়েছে 'সাম্য/স্ত্রীজাতি' প্রবন্ধে। লেখকের মতে স্ত্রীজাতিকে সামাজিক বঞ্চনার হাত থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় সমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এবং সাধারণভাবে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটানো। 'শিক্ষাই সকলপ্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ। শিক্ষার অভাবই আমাদের সমাজের দুর্বলতার, আমাদের যতকিছু সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের মূল কারণ।

'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষার উন্নতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। দেশে সাম্যের অভাব শুধু জাতিতে-জাতিতে, বর্ণে-বর্ণে, ধনী-দরিদ্রে বা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—দেশব্যাপী সাম্যের বড় অভাব সংখ্যালঘু শিক্ষিত ও অপরিমিত অশিক্ষিতের মধ্যে তীব্র। শুধু বিদ্যালয়ের পুস্তক পড়িয়ে, ব্যাকরণ জ্যামিতি শিখিয়ে দেশের সমস্ত মানুষকে শিক্ষিত করা যায় না। এবং সমগ্র দেশের মানুষের পক্ষে এই পদ্ধতির শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাও নয়। যে শিক্ষা থেকে মানুষে জানবে যে—ধর্ম নিত্য, আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, পরের জন্য জীবন, ঈশ্বর আছেন, পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, জন্ম আপনার জন্য নয় পরের জন্য, অহিংসা পরম ধর্ম, লোকহিত পরম কার্য—সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সমস্ত মানুষকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনার অত্যাবশ্যকতা বঙ্কিমচন্দ্র একশো বছর আগে অনুধাবন করেছেন এবং দেশবাসীকে তাঁর অসামান্য লেখনী দ্বারা সতর্ক ও সচেতন করে দিয়ে গেছেন। 'রামধন পোদ' এ-বিষয়ে এক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধটি 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের অন্তর্গত। এই প্রবন্ধের উপসংহারে মহাভারতের সেই কৃষ্ণকে তাঁর নমস্কার জানিয়ে বলেছেন, 'যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন' এবং 'যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে, বলিয়াছিলেন, ''বেদে ধর্ম নহে—ধর্ম লোকহিতে''—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র ; যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।' বুঝতে অসুবিধা হয় না—এ কৃষ্ণ হিন্দুর একান্ত শ্রীকৃষ্ণ মাত্র নয় ; ইনি সর্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আধার এক আদর্শ প্রতীক বিশেষ।

ধর্মের সহজ মূর্তি অতি মনোহারিণী, ধর্মশিক্ষকের হাতে পড়ে তা নিদারুণ ভীতিপ্রদ ও পৈশাচিক হয়ে উঠেছে। 'ধর্ম্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন 'যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম।' সুতরাং 'সুসাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক।'

'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধেও বঙ্কিম বলেছেন 'সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।' এই উপদেশমালায় যে বারোটি উপদেশ তিনি প্রদান করেছেন তার অনেকগুলির প্রাসঙ্গিকতা আজও যথেষ্ট বর্তমান।

দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের প্রতি দেশের তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের অনাদর অনাগ্রহ ও অজ্ঞতা কতখানি এবং কী নিদারুণ মর্মান্তিক তারই ব্যঙ্গাত্মক উদাহরণ আছে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর' শীর্ষক সংলাপধর্মী সরস রচনাটিতে।

যে মহাভারতকার কৃষ্ণ চরিত্র সৃজন করে মহাকবি রূপে পূজিত তিনি দ্রুপদরাজকন্যাকে এমন কদর্য বর্বরোচিত পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীতে পরিণত করলেন কেন ? অথচ 'প্রাচীন তত্ত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুণাক্ষরে এমন কথা নাই যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ছিল।' বঙ্কিমচন্দ্র 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাবে 'দ্রৌপদী চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত্ত্ব' তার অভিনব তাৎপর্যপূর্ণ এক গভীর ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে দ্রৌপদী মহাভারতে এক তত্ত্বচরিত্র বিশেষ, অথবা তত্ত্ববিশেষকে পরিস্ফুট করবার জন্য দ্রৌপদী চরিত্রের পরিকল্পনা। দ্রৌপদী মহাভারতে সংযতাত্মা নারী চরিত্রের উদাহরণ বিশেষ। স্বামীর ধর্মার্থে দ্রৌপদী সকল স্বামীর ঔরসে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করেছেন। দ্রৌপদী ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত বা আসক্তি রহিত ; ধর্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হলে স্বামিগণের সঙ্গে তাঁর ঐন্দ্রিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর তাই আপাত গণিকার ন্যায় পঞ্চপুরুষের সংসর্গযুক্তা হয়েও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা। এই হল দ্রৌপদী চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি তত্ত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত 'কৃষ্ণচরিত্র' একটি অসামান্য মহাগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমাদের মতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাঁহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি। প্রথমত বঙ্কিম বুঝাইয়াছেন, জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না, সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্তী হইয়া পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র। এই মূল ভাবটিই কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি, ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।' শাস্ত্রকে এমন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বা বিচার করা আমাদের দেশে সেদিন সত্যই দুর্লভ ছিল। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মতত্ত্ব' তথা সত্যতত্ত্বের স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে নির্দেশ করেছেন :

'১. যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

২. যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম্ম।

৩. অতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

৪. এইরূপ সত্য সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে প্রযোক্তব্য।'

বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে যে কখনো কোথাও সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করতে চান নি তা আমরা পুনঃপুন লক্ষ্য করেছি।

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল বক্তব্য সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

১. জাতীয় জীবনে মাতৃভাষার ব্যাপক ব্যবহার প্রয়োজন।

২. সমগ্র ভারতবর্ষকে এক জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ করা আবশ্যক।

৩. কৃষকের উন্নতি দেশের উন্নতি, কৃষকের মঙ্গল দেশের মঙ্গল।

৪. দেশের প্রজাসাধারণের সুখ ও দুঃখের উপর একটা দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা ও পরাধীনতার বিচার। দেশের রাজা স্বদেশী বা পরদেশী তার উপরে নয়।

৫. প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।

৬. সকলই নিয়মের ফল, সাহিত্যও নিয়মের ফল। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিও সেই নিয়মের অধীন।

৭. যে জাতির উদ্যম ঐক্য সাহস এবং অধ্যবসায় আছে সেই জাতিই বলশালী।

৮. যে সত্যপালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট সে সত্য পালনীয় নয়।

৯. অধর্ম চোরের নয়—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর।

১০. চন্দ্রলোকে জলও নেই, বাতাসও নেই; যদি জল বায়ু না থাকে, তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোনো জীব তথায় নেই।

১১. শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।

১২. সীতার সহস্র অনুকরণ হয়েছে, কিন্তু দ্রৌপদী অননুকরণীয়।

১৩. শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।

১৪. সমগ্র দেশের মানুষকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে তোলার জন্য লোকশিক্ষার প্রয়োজন।

১৫. দারিদ্র্যের মোকাবিলা করতে পরিবার পরিকল্পনা প্রয়োজন।

১৬. ধর্মের প্রকৃত সত্য নিহিত লোকহিতে।

১৭. যা সত্য তাই ধর্ম। সাহিত্য ধর্ম ছাড়া নয় কেননা সাহিত্য সত্যমূলক।

১৮. সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

১৯. মাতৃভাষাঅবজ্ঞাকারী তথাকথিত উচ্চদর উচ্চশিক্ষিতের ইংরেজি প্রীতি যেমন গ্লানিকর তেমনই লজ্জাজনক।

২০. আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল উপভোগ করে সংযতাত্মা পুরুষ শান্তি প্রাপ্ত হন।

২১. যাতে লোকের হিত তা-ই ধর্ম তা-ই সত্য। এই সত্য সর্বদা সর্বস্থানে পালনীয়।

কেবল এই সূত্রমালা অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনার জগৎ কত ব্যাপক ও বিস্তৃত ; এবং কেন তিনি সমগ্র দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাধিনায়ক

রূপে বরণীয়। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়োজন শুধু সাহিত্যের পাঠকসমাজের কাছে নয়, আজ তাঁকে দরকার সমগ্র দেশের স্বার্থেই। লিখে শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টি নয়, দেশের তথা মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধন করাই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ আমাকে এই গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁদের পরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধ-সংগ্রহ পরে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তর্জমা করে প্রকাশ করা। ভারতীয় ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার তর্জমা অত্যাবশ্যক বলে আমি মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বঙ্গদেশ বা বাঙালীর নন, তাঁর আবেদন আজ সমগ্র ভারতবাসীর কাছেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অতিশয় প্রাসঙ্গিক।

গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ট্রাস্টের শ্রী অরুণ চক্রবর্তী মহাশয়ের মূল্যবান সহযোগিতা পেয়ে সম্পাদক কৃতার্থ। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ও শ্রী অরুণ চক্রবর্তীকে আমার কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন
পশ্চিমবঙ্গ ৭৩১২৩৫

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বর্তমান সংগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে প্রকাশিত তাঁর পুস্তকাবলীর
শেষ সংস্করণের পাঠ গৃহীত।

বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা[১]

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য ; নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র ; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি ? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব ?

ইংরাজিভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের ''ভাষায়'' যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা ''বিষয়ী লোক,'' তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ-পৌর-কন্যা, এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মারসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

লেখা পড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্চর্, এড্রেস্, প্রোসিডিংস্, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

---

১. এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিবার কারণ এই, ইহার মধ্যে যে সকল কথা আছে, তাহার পুনরুক্তি এখনও প্রয়োজনীয়। ১২৭৯ বৈশাখে [১৮৭২ এপ্রিল] বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়।

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহুবিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।

আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরাজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলিন কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।[১] অতএব যত দূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, তত দূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্, এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

১. এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস্ এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন্ "ফিল্টর ডৌন" করিবে।[১] এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক্ শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান্ হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলেই নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালী জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্ন স্তর অর্থাৎ ইতর লোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে! জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে। ইংরাজিশিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য। এত কাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেন না, তাঁহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্য্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। ভরসা করি, বোর্ডের মণি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট লিখিবার সময়ে এই জলপানা কথাটা মনে রাখিবেন।

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এত দূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য

---

১. উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দিবার কথাটা এই সময়ে উঠিয়াছিল। তদুপলক্ষে এই কথাটা উঠিয়াছিল। উচ্চ শিক্ষাপক্ষীয় লোক এই কথা বলিতেন।

জন্মিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ-ফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক্, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্র লোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা-সম্পন্ন। যত দিন এই ভাব ঘটে নাই—যত দিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, তত দিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম্, এথেন্স্, ইংলণ্ড, এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজমধ্যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স্, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স্ এবং স্পার্টা দুই প্রতিযোগিনী নগরী। এথেন্সে সকলে সমান; স্পার্টায় এক জাতি প্রভু, এক জাতি দাস ছিল। এথেন্স্ হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল—যে বিদ্যাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব এথেন্স্ তাহার প্রসূতি। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজপীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্তপদাদিচ্ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্ম্ম-যাজকদিগের পার্থক্যহেতু, অকালে সমাজোন্নতি লোপ। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এরূপ কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যপ্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংশ্রবে আসে না। আর, পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাঁহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া উঠে।

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমরা সবিস্তারে বিবৃত করিলাম। কিন্তু রচনা-কালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করার একটি বিশেষ বিঘ্ন আছে। সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না।

''আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।''

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাষী। লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষী। যশঃ, সুশিক্ষিতের মুখে। অন্যে সদসৎ বিচারক্ষম নহে; তাহাদের নিকট যশঃ হইলে, তাহাতে রচনার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে না।

এ দিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "মহাশয়, আপনি বাঙ্গালী—বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন?" তিনি উত্তর করেন, "কোন্ বাঙ্গালা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।" আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয়খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায়। তাহার পর দুই তিন বৎসর বসিয়া না থাকিলে আর একখানি পাঠ্য বাঙ্গালা রচনা পাওয়া যায় না।

এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্ত্তাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা-সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে

সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য্য মনে করিতাম।

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, কিছুই সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব।

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা [illegible] সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি। কিন্তু [illegible] তত বর্ষে না। গর্জ্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের পক্ষে বিশেষ। আমরা যে এই কথার সত্যতার একটি নূতন উদাহরণস্বরূপ হইব না, এমত বলি না। আমাদিগের পূর্ব্বতনেরা এইরূপ এক এক বার অকালগর্জ্জন করিয়া, কালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন, এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিণাম ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদস্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।

[১২৭৯ বৈশাখ। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

ভারত-কলঙ্ক

ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?

ভারতবর্ষ এত কাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল, এই জন্য। "Effeminate Hindoos" ইউরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্ব্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার ইউরোপীয়দিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের কাছে—মহারাষ্ট্র এবং শীকের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন।

আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীর্য্য এখন যাহাই হউক, প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে তাহা ন্যূন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শত শত বৎসরের অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশ্য ঘটিয়া থাকিবে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণ পরজাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে—দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহারা পরাধীন হয়েন নাই।

আমরা স্বীকার করি যে, এই পক্ষ সমর্থন করা সহজ নহে, এবং এতদ্বিষয়ে পর্য্যাপ্ত প্রমাণপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য। এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করা সম্ভব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের যে শ্লাঘনীয় সমর-কীর্ত্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলিন "পুরাণ" বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে, তাহা অনৈসর্গিক এবং অতিমানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি তাহা কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না।

ভাগ্যক্রমে ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়-দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজণ্ডর বা সেকেন্দর দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল যবন-লেখকেরা তাহা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে সকল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকেরা বিবরিত করিয়াছেন।

কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা। মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিতস্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া, সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত যে, তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে। এই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, উভয়বিধ ইতিহাসবেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থ্য নির্ণীত হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পর-ধর্ম্মদ্বেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, নিম্নলিখিত দুইটি কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল ঐশ্বর্য্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। আরব্যেরা মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ বিনকাসিম সিন্ধুদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতানা হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে সিন্ধু রাজপুতগণ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ভারত জয় দিগ্বিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিন্‌ষ্টোন বলেন যে, হিন্দুদিগের দেশীয় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি রণনৈপুণ্য, যোধশক্তি। হিন্দুদিগের আত্মধর্ম্মানুরাগ অদ্যাপি ত বলবৎ। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরজাতি-পদানত?

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর দুর্জ্জেয় হইয়াছিল, এতাদৃশ আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্ত্তৃক যত অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরক, এবং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে গ্রীস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য

২৬৪ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্ব্ব রোমক বা গ্রীক সাম্রাজ্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম অদ্যাপি জগতের বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ, তাহাই ২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরীয় বর্ব্বরজাতি কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্ব্বর বিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে পাঁচ শত ঊনত্রিশ বৎসর পরে শাহাবুদ্দিন ঘোরী কর্ত্তৃক উত্তরভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দিন বা তাঁহার অনুচরেরা আরব্যজাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফলযত্ন হইয়াছিল, গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রূপ। যাহারা পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তরভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান। আরব্যদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে, তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল। পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকীবংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্ব্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুরকী, এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।[১]

মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের সুসময় প্রায় অতীত হইয়াছিল,—রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে মলিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত পরিচয়। তাহারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান্। তাহারা ভূয়োভূয়ঃ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে। মাকিদনীয় বিপ্লব বর্ণনকালে তাহারা এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়া প্রদেশে এইরূপ রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই। এবং হিন্দুগণ কর্ত্তৃক যেরূপ গ্রীকসৈন্যহানি হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন জাতি কর্ত্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তান্তলেখক গ্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক ভারতাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসিক, যোন, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী, সকলেই আসিয়াছে, এবং সিন্ধুপারে বা তদুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের

১. পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র।

জন্য অধিকৃত করিয়া, পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত আর্য্যেরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলীভূত হইয়া এত কাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না।

এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শুনা যায় যে হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ। অদূরদর্শীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে।

প্রথম,—হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই;—আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়? লোকের ধর্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্ জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ— রোমকলিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধগুণের পরিচয়,—গ্রীকলিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই—কেন না, সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।

দ্বিতীয় কারণ,—যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, পররাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীরগৌরব লাভ করে নাই। ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যাপি এ দেশীয় ভাষায় "ভাল মানুষ" শব্দের অর্থ—ভীরুস্বভাবের লোক, অকর্ম্মা। "হরি নিতান্ত ভাল মানুষ।" অর্থ—হরি নিতান্ত অপদার্থ!

হিন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশূন্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না। তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, হিন্দুরাজ্যকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র মণ্ডলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না; কোন হিন্দু রাজা কস্মিন্ কালে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন; তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে, বরং তদ্দেশ-জয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি-ধর্ম্ম বিনাশের শঙ্কা করিবারই সম্ভাবনা। অতএব সক্ষম হইলেও হিন্দুর ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাঙ্ক্ষায় যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজ্যের অধিকাংশ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া গণ্য হইত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ—হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীরগৌরব কি? কিন্তু এক্ষণকার হিন্দুদিগের বীর্য্য-লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে। ইটালী ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণস্থল। মধ্যকালিক ইটালীয়, এবং বর্ত্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগকে কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা যাদৃশ অন্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের বললাঘব সিদ্ধ করা তাদৃশ অন্যায়।

আমরা এমতও বলি না যে, আধুনিক ভারতবর্ষীয়েরা নিতান্ত কাপুরুষ, এবং সেই জন্য এত কাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার দুইটি কারণ সবিস্তারে এ স্থলে নির্দ্দিষ্ট করি।

প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারহিত। স্বদেশীয় স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজশাসন মঙ্গলকর বা সুখের আকর, পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়ঙ্গত নহে। পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল, এরূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সেটি বোধমাত্র—সে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষায় পরিণত নহে। অনেক বস্তু আমাদিগের ভাল বলিয়া জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে তৎপ্রতি সকল স্থানে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। কে না হরিশচন্দ্রের দাতৃত্ব বা কার্শিয়সের দেশবাৎসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার মধ্যে কয় জন হরিশচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী বা কার্শিয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত? প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা বলবতী আকাঙ্ক্ষায় পরিণত। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তব্য। হিন্দুদের মধ্যে তাহা নহে। তাঁহাদিগের বিবেচনা—"যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি?" স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান। স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে, পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরতা নাই, তবে কেন স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। আমাদিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে না, কেহই চোরকে পুরস্কৃত করিবে না। যে রাজা হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না।[১]

---

১. আমরা এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতন্ত্র্যভক্ত জাতি ছিল না। মীবার-রাজপুতদিগের অপূর্ব্ব কাহিনী যাঁহারা টডের গ্রন্থে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐ রাজপুতগণ হইতে স্বাতন্ত্র্যোন্মত্ত জাতি কখন পৃথিবীতে দেখা দেয় নাই। সেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার ফলও চমৎকার।

আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্র্যপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথার ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা অস্বাভারিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও নহে। স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ; স্বভাববশতঃ কোন জাতি সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশূন্য। এই সংসারে অনেকগুলিন স্পৃহণীয় বস্তু আছে ; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর জন্য যত্নবান্ হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই স্পৃহনীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধনসঞ্চয়েই রত, যশের প্রতি তাহার অনাদর ; অন্য ব্যক্তি যশোলিপ্সু, ধনে হতাদর। রাম ধনসঞ্চয়ে একব্রত হইয়া কার্পণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে ; যদু অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া দাতৃত্বাদি গুণে যশঃ সঞ্চয় করিতেছে। রাম ভ্রান্ত, কি যদু ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে, উভয়মধ্যে কাহারও কার্য্য স্বভাববিরুদ্ধ নহে। সেইরূপ গ্রীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয় ; হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তিসুখের অভিলাষী ; ইহা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিত্র্যের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে।

কিন্তু অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাভের জন্য উৎসুক নহে, ইহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে, হিন্দুরা দুর্ব্বল, রণভীরু, স্বাধীনতালাভে অক্ষম ; এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী বা যত্নবান্ নহে। অভিলাষী বা যত্নবান্ হইলেই লাভ করিতে পারে।

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব, এমত আমরা বলি না ; ইহা হিন্দুজাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত বৎসর স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে পূর্ব্বতন হিন্দুগণকে স্বাধীনতাপ্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ কাব্য নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা যায় না যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্য সম্পত্তি রক্ষায় যত্ন, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভাকাঙ্ক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, এ সকল নূতন কথা।

ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে তাহাও দুর্জ্ঞেয় নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশয্য প্রভৃতি

মীবার ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়াও ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা উড়াইয়াছে। আকবর বাদসাহের বাহুবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয় নাই। অদ্যাপি উদয়পুরের রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ হিন্দুসম্বন্ধে যথার্থ।

ইহার গৌণ কারণ। ভূমি উর্ব্বরা, দেশ সর্ব্বসামগ্রী-পরিপূর্ণ, অল্পায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। লোককে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেষ্ট। শারীরিক পরিশ্রম হইতে অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়; ধ্যানের বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব, জগত্তত্ত্বে পাণ্ডিত্য। এই জন্য হিন্দুরা অল্পকালে অদ্বিতীয় কবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন। কিন্তু মনের আভ্যন্তরিক গতির দ্বিতীয় ফল বাহ্য সুখে অনাস্থা। বাহ্য সুখে অনাস্থা হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা এই স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক অংশ মাত্র। আর্য্য ধর্ম্মতত্ত্বে, আর্য্য দর্শন-শাস্ত্রে এই অচেষ্টা-পরতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম্ম, সকলেই এই নিশ্চেষ্টতারই সম্বর্দ্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনের উৎপত্তি; তদনুসারে লয় বা ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ; নিষ্কামত্বই পুণ্য। বৌদ্ধধর্ম্মের সার,—নির্ব্বাণই মুক্তি।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যদি চিরকাল স্বাতন্ত্র্যে হতাদর, তবে মুসলমানকৃত জয়ের পূর্ব্বে সার্দ্ধ সহস্র বৎসর তাহারা কেন যত্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতি বিমুখ পূর্ব্বক স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, অনেক কষ্টে হইয়া থাকিবে। যে সুখের প্রতি আস্থা নাই, সে সুখের জন্য হিন্দুসমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল?

উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবন প্রভৃতিকে বিমুখীকরণ জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। হিন্দুরাজগণ আপনার রাজ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত; যখন পারিত, শত্রু বিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইত; তদ্ভিন্ন যে "আমাদের দেশে ভিন্নজাতীয় রাজা হইতে দিব না" বলিয়া সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বা উদ্যমশালী হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা হয়। যখনই সমরলক্ষ্মীর কোপদৃষ্টিপ্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছেন, তখনই হিন্দুসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেন না, আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত বা অন্য কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারসীক, শক বা বাহ্লিক, কোন প্রদেশখণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে পূর্ব্বপ্রভুর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি করে নাই। তিন সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, আর্য্যের সঙ্গে আর্য্যজাতীয়, আর্য্যজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্নজাতীয়;—মগধের সঙ্গে কান্যকুব্জ, কান্যকুব্জের সঙ্গে দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ—সকলের সঙ্গে

সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্বলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ ; সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভূয়োভূয়ঃ ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে কখন কোন পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না ; কেন না, সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই।

এই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আসিয়া পড়িল। সে কারণ,—হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব, অথবা অন্য যাহাই বলুন। আমরা সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছি।

আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্ত্তব্য আর এইরূপ অকর্ত্তব্য, তোমারও তদ্রূপ, রামের তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি একরূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্ত্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে, এই জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ ; অর্দ্ধাংশ মাত্র।

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না ; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতি-প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্যে অনেক বার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে।

স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার

প্রভাবে ইটালি একরাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন জর্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। আরও কি হইবে বলা যায় না।

এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কস্মিন কালে ছিল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্যজাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্ষবাসী নহে। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম আর্য্যজয়ের সময়ে বেদাদির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। বৈদিক কালে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা যে আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবতী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদিমধ্যে পাওয়া যায়। তৎকালিক সমাজ-নিয়ন্তা ব্রাহ্মণেরা যে রূপে সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ঐ জ্ঞানের পরিচয়স্থল। আর্য্য বর্ণে এবং শূদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে আর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না। আর্য্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহ্লিক হইতে পৌণ্ড্র পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূমি মক্ষিকাসমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে, কপিলবাস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্ম্মভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম্ম; আর একজাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাশূন্য হইল। পরে আবার মুসলমান আসিল। মুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালে, সাগরোর্ম্মির উপর সাগরোর্ম্মিবৎ নূতন নূতন মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পর্ব্বতপার হইতে আসিতে লাগিল। দেশীয় লোকে সহস্রে সহস্রে রাজানুকম্পার লোভে বা রাজপীড়নে মুসলমান হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ষবাসিগণ মুসলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু, মুসলমান, মোঘল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্র কর্ম্ম করিতে লাগিল। তখন জাতির ঐক্য কোথায়? ঐক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে?

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্ম্মের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালি, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্ম্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুত জাঠ, এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালি বেহারী একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক; যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিজাতির একতা বোধ নাই, শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা বোধ নাই।

ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ ঘটে। তাহাদের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না। রোমক সাম্রাজ্যমধ্যগত জাতিদিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি-প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া কখন হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক কোন জাতীয় কার্য্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দুরাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখন তর্জ্জনীর বিক্ষেপও করে নাই।

ইতিহাসকীর্ত্তিত কালমধ্যে কেবল দুই বার হিন্দুসমাজমধ্যে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার, মহারাষ্ট্রে শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এই আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। চিরজয়ী মুসলমান হিন্দু কর্ত্তৃক বিজিত হইল। সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত হইল। অদ্যাপি মহারাষ্ট্র, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে।

দ্বিতীয় বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রুপারে সিংহনাদ শুনিয়া, নির্ভীক ইংরেজও কম্পিত হইল! ভাগ্যক্রমে ঐন্দ্রজালিক মরিল। পটুতর ঐন্দ্রজালিক ডালহৌসির হস্তে খালসা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালা ইতিহাসে লেখা রহিল।

যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এত দূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্ত-ভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা।[১] ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।

[১২৭৯ বৈশাখ। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

১. এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।

বঙ্গদেশের কৃষক

(''বঙ্গদেশের কৃষকে'' এদেশীয় কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আর নাই। জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। কৃষকদিগের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দুর্ব্বল। এই সকল কারণে আমি এত দিন এ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এক্ষণে যে আমি ইহা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি, তাহার অনেক গুলি কারণ আছে। ১. ইহাতে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা জানা যায়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তার ইহা কার্য্যে লাগিতে পারে। ২. ইহার পর হইতে কৃষকদিগের অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার প্রথম সূত্রপাত, সুতরাং পুনর্মুদ্রিত হইবার এ প্রবন্ধ একটু দাবি দাওয়া রাখে। ৩. ইহাতে কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এখনও অনেক প্রদেশে অপরিবর্ত্তিতই আছে। যতগুলি উৎপাতের কথা আছে, তাহা সব কোন স্থানেই এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। ৪. এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন কিছু যশোলাভ করিয়াছিল, এবং ৫. আমি বঙ্গদর্শনে ''সাম্য'' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পশ্চাৎ তাহা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলাম। ''বঙ্গদেশের কৃষক'' আর পুনর্মুদ্রিত করিব না, বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ ''সাম্য''-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই ''সাম্য'' শীর্ষক পুস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি। সুতরাং ''বঙ্গদেশের কৃষক'' পুনর্মুদ্রিত করার আর একটা কারণ হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তিশূন্য মনে করি না। কিন্তু অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন্ কথা ভ্রান্তি, আর কোন্ কথা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য। অতএব কোন প্রকার সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশের শ্রীবৃদ্ধি

আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগ্‌গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণি ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া

তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে। সে রোগ পূর্ব্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখন্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস ছিল। ঐ যে দেখিতেছ রাজপথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে; এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া সপ ছিল, এখন সেখানে কার্পেট্, কৌচ, ঝাড়, কাণ্ডেলাব্রা, মার্বেল, আলাবাষ্টার্—কত বলিব? যে বাবু দূরবীণ কষিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিলে উনি এত দিন চাল কলা ধূপ দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি যে হতভাগা, চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ্ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্ব্বে হইলে, আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট্ নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই কচ্‌কচিতে মাতা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর!

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাতায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাতা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় ত চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইতেছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?

আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার করি। আমরা এই প্রবন্ধে একটি উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ।

ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত। পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া যে, দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরে যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে। দস্যুভীতি, চৌরভীতি, বলবৎকর্ত্তৃক দুর্ব্বলের সম্পত্তিহরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। আবার রাজা বা রাজপুরুষেরা প্রজার সঞ্চিতার্থ সংগ্রহ-লালসায় যে বলে ছলে কৌশলে লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ করিবেন, সে দিনও নাই। অতএব যদি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারীরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে। যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবার প্রতিপালনশক্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসারধর্ম্মে বিরাগী। পরিণয়াদিতে সাধারণ লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব ব্রিটিশ্ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাবৃদ্ধির ফল, কৃষিকার্য্যের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্যের আবশ্যক, সে দেশে বাণিজ্যের প্রয়োজন বাদে কেবল তদুপযুক্ত ভূমিই কর্ষিত হইবে,— কেন না, অনাবশ্যক শস্য—যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে,—তাহা কে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা তদ্রূপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে। কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি আবাদ না করিলে চলে না। কেন না, যে ভূমির উৎপন্নে লক্ষ লোকমাত্র প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্যে দেড় লক্ষ কখন চিরকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাষ বাড়িবে। যাহা পূর্ব্বে পতিত বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে। ব্রিটিশ্ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হওয়াতে সেইরূপ হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কর্ষিত হইতেছে।

আর এক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্যবৃদ্ধি। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। আমরা যদি ইংলণ্ডের বস্ত্রাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অনেকে বলিবেন, "টাকা"; তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর ভ্রম। সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলণ্ডে যায়,—সেই টাকাটি ভারতব্যাপারে ইংলণ্ডের মুনাফা। সে টাকা ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত সামগ্রীর কোন অংশের মূল্য নহে, যদি বিবেচনা কর, তাহাতেও হানি নাই। অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্যসকল পাঠাই—যথা, চাউল, রেশম, কার্পাস, পাট, নীল ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেশে চাষও বাড়িবে। ব্রিটিশ্ রাজ্য হইয়া পর্য্যন্ত এ দেশের বাণিজ্য বাড়িতেছে—সুতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর বৎসর অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতি বৎসর চাষ বাড়িতেছে।

চাষ বৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধনবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি। যদি পূর্ব্বে ১০০ বিঘা জমী চাষ করিয়া বার্ষিক ১০০ টাকা পাইয়া থাকি, তবে ২০০ বিঘা চাষ করিলে, ন্যূনাধিক[১] ২০০ টাকা পাইব, ৩০০ শত বিঘা চাষ করিলে, ৩০০ টাকা পাইব। বঙ্গদেশে দিন দিন চাষের বৃদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আর একটা কথা আছে। সকলে মহাদুঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিনপাত করা ভার—দ্রব্য সামগ্রী বড় দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। এই কথা নির্দ্দেশ করিয়া অনেকেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্ত্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দুঃসময়, ইংরাজের রাজ্য প্রজাপীড়ক রাজ্য, এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধর্ম্মাক্রান্ত যুগ—দেশ উৎসন্ন গেল! ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহা সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক, দ্রব্যের বর্ত্তমান সাধারণ দৌর্ম্মূল্য দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটি মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে; যেখানে টাকায় তিন সের ঘৃত ছিল, সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় না যে, বস্তুতঃ চাউল বা ঘৃত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহাই হউক, এক টাকার ধান এখন যে দুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে দুই তিন টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ টাকা হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে।

---

১. সমাজতত্ত্ববিদেরা বুঝিবেন, এখানে "ন্যূনাধিক" শব্দটি ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, কিন্তু সাধারণপাঠ্য এই প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

আবার পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কর্ষিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। তবে দুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে ; প্রথম, কর্ষিত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয়, ফসলের মূল্যবৃদ্ধিতে। যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া, আর ছয় টাকা ; মোটে তিন টাকার স্থানে বার টাকা জন্মিতেছে।

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার ঘরে যায় ? কে লইতেছে ?

এ ধন কৃষিজাত—কৃষকেরই প্রাপ্য—পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। কে পায়, আমরা দেখাইতেছি।

কিছু রাজভাণ্ডারে যায়। গত সন ১৮৭০/৭১ সালের যে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা রেবিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব লিখেন, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব ধার্য্য ছিল, সেই প্রদেশে হইতে এক্ষণে ৩,৫০,৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে। অনেকে অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বৃদ্ধি কি ? শক্ সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথা, তৌফির বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেআপ্ত, নূতন ‘‘পয়স্তি’’ ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। অনেকে বলিবেন, ঐ সকল বৃদ্ধি যাহা হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্তু শক্ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিয়মিতরূপে হইতেছে। পূর্ব্বাবধারিত করের উপর বেশী যাহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট্ পাইতেছেন—সাড়ে বাষট্টি লক্ষ টাকা—তাহা কৃষিজাত ধন হইতেই পাইতেছেন।

এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাণ্ডারে যাইতেছে। আফিমের আয়ের অধিকাংশই কৃষিজাত। কষ্টম্‌হৌসের দ্বার দিয়াও রাজভাণ্ডারে কৃষিজাত অনেক ধন যায়।

শক্ সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি অধিকাংশই বণিক্ এবং মহাজনদিগের হস্তগত হইয়াছে। বণিক্ এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বাড়িয়াছে। এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহাদের লাভস্বরূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু কৃষিজাত ধনের বৃদ্ধির অধিকাংশই যে তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা শক্ সাহেবের ভ্রমমাত্র। এ ভ্রম কেবল শক্ সাহেবের একার নহে। ‘‘ইকনমিষ্ট্’’ এই মতাবলম্বী। ‘‘ইকনমিষ্টে’’র ভ্রম ‘‘ইণ্ডিয়ান্ অবজর্‌বরে’’র নিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সে তর্ক এখানে উত্থাপনের আবশ্যক নাই।

অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অস্থায়ী ; জমীদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক

স্থানেই অদ্যাপি আকাশকুসুম মাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, সেখানে কার্য্যে নাই। অধিকার থাক্ বা না থাক্, জমীদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। কয়জন প্রজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে? সুতরাং যে বেশী খাজানা স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমীদার বসাইবেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই বটে,[১] কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ। প্রজাবৃদ্ধি হইলেই জমীর খাজানা বাড়িবে। যে ভূমির আগে এক জন প্রার্থী ছিল, প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য দুই জন প্রার্থী দাঁড়াইবে। যে বেশী খাজানা দিবে, জমীদার তাহাকেই জমি দিবেন। রামা কৈবর্ত্তের জমীটুকু ভাল, সে এক টাকা হারে খাজানা দেয়। হাসিম শেখ সেই জমী চায়—সে দেড় টাকা হার স্বীকার করিতেছে। জমীদার রামাকে উঠিতে বলিলেন। রামার হয় ত দখলের অধিকার নাই, সে অমনি উঠিল। নয় ত অধিকার আছে, কিন্তু কি করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করিবে কি প্রকারে? অধিকার বিসর্জ্জন দিয়া সেও উঠিল। জমীদার বিঘা পিছু আট আনা বেশী পাইলেন।

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন সুযোগে না কোন সুযোগে, দেশের অধিকাংশ ভূমির হার বৃদ্ধি হইয়াছে। আইন আদালতের আবশ্যক করে নাই—বাজারে যেরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে ঝিঙ্গা পটলের দর বাড়ে, প্রজাবৃদ্ধিতে সেইরূপ জমীর হার বাড়িয়াছে। সেই বৃদ্ধি, জমীদারের উদরেই গিয়াছে।

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, আইন আছে, নিরিখ আছে, জমীদারের দয়া ধর্ম্ম আছে। আইন—সে একটা তামাসা মাত্র—বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে। নিরিখ পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে। আর জমীদারের দয়া ধর্ম্ম—যখন আর স্ক্রু ফিরে না, তখন লোকের দয়া ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়।[২] স্ক্রু ফিরাইয়া ফিরাইয়া, বঙ্গদেশের অধিকাংশ বর্দ্ধিত ধার্য্য আয় ভূস্বামিগণ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমীদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে। কোথাও দশগুণ হইয়াছে। কিছু না বাড়িয়াছে, এমন জমীদারী অতি অল্প।

আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রেরিত কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক্ পায়েন. মহাজন পায়েন,—কৃষী কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পায়?

আমরা এমত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দু বিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে। যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। অদ্যাপি ভূমির উৎপন্নে

---

১. যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন census হয় নাই।

২. আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, সকল ভূস্বামী এ চরিত্রের নহেন। অনেকের যথার্থ দয়া ধর্ম্ম আছে।

তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষকসম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাতার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন, সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয় গান করিব না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জমীদার

জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, শফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।

আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি। কোন জমীদার কর্ত্তৃক কখন আমাদিগের অনিষ্ট হয় নাই। বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। যে সুহৃদ্গণের প্রীতি আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে গণনা করি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে জমীদার। জমীদারেরা বাঙ্গালী জাতির চূড়া, কে না তাঁহাদিগের প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে? কিন্তু আমরা যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে প্রীতিভাজন্ হওয়া দূরে থাকুক, যিনি আমাদের কথা ভাল করিয়া না বুঝিবেন, হয় ত তাঁহার বিশেষ অপ্রীতিপাত্র হইব। তাহা হইলে, আমরা বিশেষ দুঃখিত হইব। কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যানুরোধে তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম,

তবে মহাপাপ স্পর্শে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয় ত সমাজশ্রেষ্ঠ ভূস্বামিমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইব—অনেকের নিকট তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত, উপহসিত, অমর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইব—বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন হইব। কাহারও নিকট মূর্খ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটুক। যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাতরের হইয়া কাতরোক্তি না করে,—পীড়িতের পীড়া নিবারণের জন্য যত্ন না করে,— যদি কোন প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক। যাঁহারা নীচ, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা বলিবেন, আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা আমাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন,—এই ভিক্ষা। আমরা জানিয়া শুনিয়া কোন অযথার্থোক্তি করিব না। বরং আমাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ হইয়া তাহা স্বীকার করিব। যতক্ষণ না সে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহা বলিব, মুক্তকণ্ঠেই বলিব।

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা 'জমীদার সম্প্রদায়' সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদার মাত্রেই দুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি নিতান্ত মিথ্যাবাদী। অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবৎসল, এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্ত্তে না। কতকগুলি জমীদার অত্যাচারী; তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমীদার বলিয়াছি বা বলিব, সেইখানে ঐ অত্যাচারী জমীদারগুলিই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় 'জমীদার সম্প্রদায়' বুঝিবেন না।

বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী সুদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে দুই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল, তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজানা দিতে হইবে। তাহা দিল। পরে যাহা বাকি রহিল—অল্লাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চর্ব্বিত ইক্ষুর রস, শুষ্ক পল্বলের মৃত্তিকাগত বারি—তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন।—

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল—কাহারও বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া,

সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্র মাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা; চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, "তোমার পৌষের কিস্তি তিন টাকা বাকি আছে।" পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল—দোহাই পাড়িল—হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কষিল। জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা। তিন বৎসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা। তিন টাকা বাকির সুদ ৸০ আনা। পরাণ তিন টাকা বার আনা দিল। পরে চৈত্র কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্ব্বণী। নাএব গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরী, পাইক, সকলেই পার্ব্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল।

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এ সব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপূর্ত্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে?

তাহার পর আষাঢ় মাসের নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর নাএব মহাশয় আছেন—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা, তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা তাঁহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল—তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। ঐ দিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল, আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন্ ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কর্জ্জ দিয়া, তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, অন্য কীটের দৌরাত্ম্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ্জ দেয়; নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা "রিলিফ," কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসার স্থল নহে। মনে কর, সে বার সুবৎসর। পরাণ মণ্ডল কর্জ্জ পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

পরে ভাদ্রের কিস্তি আসিল। পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা, কোটাল বা তদ্রূপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ কর্জ্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুর্বুদ্ধি ঘটিল—সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা করিল। পিয়াদা ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল, "পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বলিয়াছে।" তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহারা পরাণকে মাটি ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল—শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাঁচ গুণ জরিমানা করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিল। নচেৎ পরাণ এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন কাছারিতে রহিল। হয় ত পরাণের মা কিম্বা ভাই থানায় গিয়া এজেহার করিল। সব্ ইন্স্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কন্‌ষ্টেবল পাঠাইলেন। কন্‌ষ্টেবল সাহেব—দিন দুনিয়ার মালিক—কাছারিতে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। পরাণ তাঁহার

কাছেই বসিয়া—একটু কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল। কন্‌ষ্টেবল সাহেব একটু ধুমধাম করিতে লাগিলেন—কিন্তু "কয়েদ খালাসের" কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনভুক্—বৎসরে দুই তিন বার পার্ব্বণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। সে দিনও সর্ব্বসুখময় পরমপবিত্রমূর্ত্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র দৃষ্টিমাত্রেই মনুষ্যের হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়—ভক্তি প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, "কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক—সে পুকুর-ধারে তালতলায় লুকাইয়াছিল—আমি ডাক দিবা মাত্র সেইখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।" মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজি গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, "পরাণ আমাকে লইয়া খায় না"—তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল ঐরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, "পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে"—অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সম্বাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে—অমনি পরাণকে ধরিতে ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক বা জামিন লইয়াই হউক বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক বা সময়ান্তরে বিহিত করিবার আশায়ই হউক, পুনর্ব্বার পুলিস আসার আশঙ্কায়ই হউক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখায় কোন ফল নাই বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ বা ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার টাকা, মহালে মাঙ্গন চড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর।• আনা দিবে। তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিবে, দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে—তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে।

যে প্রজা পারিল, সে দিল—পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই—সে দিতে পারিল না। জমীদারী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন। তাঁহার আগমন হইল—গ্রাম পবিত্র হইল।

তখন বড় বড় কালো কালো পাঁটা আনিয়া, মণ্ডলেরা কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল, উঠনে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। বড় বড় কালো কালো বার্ত্তাকু, গোল আলু, কপি, কলাইসুঁটিতে ঘর পুরিয়া যাইতে লাগিল। দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে ''আগমনী,'' ''নজর'' বা ''সেলামি'' দিতে হইবে। আবার টাকার অঙ্কে ৵০ বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল।

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ষ্টাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত আদালতে ''ক্রোক সহায়তার'' প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য্য এই, ''পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়েত করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।'' গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলেরই যত অত্যাচার। সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়া জমীদারের কাছারিতে পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম ''ক্রোক সহায়তা।''

পরাণ দেখিল, সর্ব্বস্ব গেল। মহাজনের ঋণও পরিশোধ করিতে পারিব না, জমীদারের খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সহিয়াছিল—কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে । আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্টাম্পের মূল্য চাই; উকীলের ফিস্ চাই; আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই; সাক্ষীর খোরাকি চাই; সাক্ষীদের পারিতোষিক আছে; হয় ত আমীন-খরচা লাগিবে; এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিঃস্ব।—তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহা অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল ছিল।

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদুল করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা—সুতরাং জমীদারের বশীভূত—স্নেহে নহে—ভয়ে বশীভূত। সুতরাং তাঁহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রে সেই পথবর্ত্তী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অদুল করিয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্মিস্ হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই নিজের খরচা ঘর হইতে গেল।

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে ? যদি জমী বেচিয়া দিতে পারিল, তবে দিল, নচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচারগুলিন সকলই এক জন প্রজার প্রতি এক বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এরূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে, দেশ রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি—একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ করিয়া প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারেরা যত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আজি এক জনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অন্যরূপ পীড়ন হইয়া থাকে।

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত নহে। জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্ব্বত্র এক নিয়ম নহে; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা একটি যথার্থ ঘটনা বিবৃত করিয়া একখানি তালিকা উদ্ধৃত করিব।

যে প্রদেশ গত বৎসর[1] ভয়ানক বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই প্রদেশের একখানি গ্রামে এই ঘটনা হইয়াছিল। গ্রামের নাম যিনি জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩১ আগষ্টের অবজর্ব্বরের ১৩১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। বন্যায় অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হইল। গ্রামখানি সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় জলে ভাসিতে লাগিল। গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। গোরু সকল অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ শশব্যস্ত। সে সময়ে জমীদারের কর্ত্তব্য—অর্থদানে, খাদ্যদানে প্রজাদিগের সাহায্য করা। তাহা দূরে থাক, খাজানা মাপ করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও দূরে থাক, খাজানাটা দুদিন রহিয়া বসিয়া লইলেও কিছু উপকার হয়। কিন্তু রহিয়া বসিয়া খাজানা লওয়া দূরে থাক, গোমস্তা মহাশয়েরা সেই সময়ে পাইক পিয়াদা সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য আসিয়া দলবল সহ উপস্থিত হইলেন। গ্রামে মোটে ১২/১৪ জন খোদকাস্ত প্রজা, এবং ১২/১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক। একটি তালিকা করিয়া ইহাদের নিকট ৫৪৶০ আদায় করিতে বসিলেন। সে তালিকা এই ;—

নায়েবের পুণ্যাহের নজর	...	৬৲
জমীদারদিগের পাঁচ শরিকের নজর	...	৫৲
গোমস্তাদিগের নজর	...	২৲
পুণ্যাহের পিয়াদার তলবানা	...	১৲
গোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ	...	১৲
আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবানা	...	৸৴০
ভাদ্রের কিস্তির পিয়াদার তলবানা	..	১।৴০
নৌকা ভাড়া	...	১॥০

১. সন ১২৭৮

সদর আমলার পূজার পার্ব্বণী	...	৬৷৷৹
কাছারির জমাদার	...	১৲
ঐ হালশাহানা	...	১৲
পাঁচ শরিকের পার্ব্বণী	...	৫৲
শ্রীরাম সেন, হেড মুহুরি	...	১৲
জমীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা	...	২৲
গোমস্তাদের ভিক্ষা	...	১২৲
মুহুরিদের ভিক্ষা	...	৩৲
বরকন্দাজদিগের দোলের পার্ব্বণী	...	১৲
ডাকটেক্স	..	৩৲
		৫৪৵৹

এই দুঃখের সময়ে প্রজাদিগের উপর টাকায় তিন আনা করিয়া বাজে আদায় পড়তা পড়িল। আদায় করা অসাধ্য ; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা কায়ক্লেশে মেঙ্গেপেতে, বেচে কিনে, হাওলাত বরাত করিয়া, ঐ টাকা দিল। লোকে মনে করিবে, মনুষ্যদেহে সহ্য অত্যাচারের চরম হইয়াছে। কিন্তু গোমস্তা মহাশয়েরা তাহা মনে করিলেন না। তাঁহারা জানেন, একটি একটি প্রজা একটি একটি কুবের। যে দিন টাকায় তিন আনা হারে ৫৪৵৹ আদায় করিয়া লইয়া গেলেন, তাহার ৪/৫ দিন মধ্যেই আবার উপস্থিত। বাবুদের কন্যার বিবাহ। আর ৪০ টাকা তুলিয়া দিতে হইবে।

প্রজারা নিরুপায়। তাহারা একখানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া নীলকুঠীতে গিয়া কর্জ্জ চাহিল। কর্জ্জ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত পাতিল—মহাজনও বিমুখ হইল।

তখন অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন করিল—ফৌজদারিতে গিয়া নালিশ করিল। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আশামীদিগকে সাজা দিলেন। আশামীরা আপিল করিল, জজ সাহেব বলিলেন, "প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন অনুসারে আমি আশামীদিগকে খালাস দিলাম।" সুবিচার হইল। কে না জানে, বিচারের উদ্দেশ্য আশামী খালাস ?

এটি উপন্যাস নহে। আমরা ইণ্ডিয়ান্ অব্‌জর্ব্বর্ হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম। দুষ্ট লোক সকল সম্প্রদায়মধ্যেই আছে, দুই একজন দুষ্ট লোকের দুষ্কর্ম্ম উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা অবিচার। যদি এ উদাহরণ সেরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা আমরা প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহা নহে—এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই জানেন না।

উপরে লিখিত তালিকার শেষ বিষয়টির উপর পাঠক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন,—"ডাকটেক্স"। গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ কর বসাইতেছেন, জমীদারেরা তাহা

লইয়া মহাকোলাহল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কি ঘর হইতে টেক্স দিয়া থাকেন ? ঐ ''ডাকটেক্স'' কথাটি তাহার প্রমাণ। গবর্ণমেণ্ট বিধান করিলেন, মফঃস্বলে ডাক চলিবে, জমীদারেরা তাহার খরচা দিবেন। জমীদারেরা মনে মনে বলিলেন, ''ভাল, দিতে হয় দিব, কিন্তু ঘরে থেকে দিব না। আমরাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। যদি বসাইতে হইল, তবে একটু চাপাইয়া বসাই, যেন কিছু মুনাফা থাকে।'' তাহাই করিলেন। প্রজার খরচে ডাক চলিতে লাগিল—জমীদারেরা মাঝে থাকিয়া কিছু লাভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট যখন টেক্স বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, কাহার ঘাড়ে পড়ে।

ইন্‌কম্‌টেক্সও ঐরূপ। প্রজারা জমীদারের ইন্‌কম্‌টেক্স দেয়। এবং জমীদার তাহা হইতেও কিছু মুনাফা রাখেন।

খাস মহল যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে রোড্ ফণ্ড্ দিতে হয়। ঐ রোড্ ফণ্ড্ আমরা ভূস্বামীর জমাওয়াশীল বাকিভুক্ত দেখিয়াছি।

রোড্‌সেস্ এই প্রবন্ধ লিপির সময় পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কোথাও হইতে আদায় করেন নাই। কিন্তু জমীদারেরা কেহ কেহ আদায় করিতেছেন। আদায় করিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার অধিক হইতে পারে না। এক জেলায় এক জন জমীদার ইহার মধ্যে টাকায় চারি আনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন প্রজা দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজা নালিশ করিল, এবার আশামী ''আইন অনুসারে'' খালাস পাইল না। জমীদার মহাশয় এক্ষণে শ্রীঘরে বাস করিতেছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নলিখিত ''হাস্পাতালির'' বৃত্তান্তটি কৌতুকাবহ। সব্‌ডিবিজনের হাকিমেরা স্কুল, ডিস্পেন্সরি করিতে বড় মজবুত। ২৪ পরগণার কোন আসিষ্টাণ্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ স্বীয় সব্‌ডিবিজনে একটি ডিস্পেন্সরি করিবার জন্য তৎপ্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়া সভা করিলেন। সকলে কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন। একজন বাটী গিয়া হুকুম প্রচার করিলেন যে, ''আমাকে মাসে মাসে এত টাকা হাস্পাতালের জন্য চাঁদা দিতে হইবে, অতএব আজি হইতে প্রজাদিগের নিকট টাকায় ／০ আনা হাস্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে।'' গোমস্তারা তদ্রূপ আদায় করিতে লাগিল। এ দিকে ডিস্পেন্সরির সকল যোগাড় হইয়া উঠিল না—তাহা সংস্থাপিত হইল না। সুতরাং ঐ জমীদারকে কখন এক পয়সা চাঁদা দিতে হইল না। কিন্তু প্রজাদিগের নিকট চিরকাল টাকায় এক আনা হাস্পাতালি আদায় হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে জমীদার ঐ প্রজাদিগের খাজানার হার বাড়াইবার জন্য ১৮৫৯ সালের দশ আইনের নালিশ করিলেন। প্রজারা জবাব দিল যে, ''আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এক হারে খাজানা দিয়া আসিতেছি—কখন হার বাড়ে কমে নাই—সুতরাং আমাদিগের খাজানা বাড়িতে পারে না।'' জমীদার তাহার প্রত্যুত্তর এই দিলেন যে, উহারা অমুক সন হইতে হাস্পাতালি বলিয়া ／০ খাজানা বেশী দিয়া আসিতেছে। সেই হেতুতে আমি খাজানা বৃদ্ধি করিতে চাই।

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই—যাহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় ঐরূপ। বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে ;—অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাঁহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে—অধর্ম্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর ২৫ হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাঁহার জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, অথচ জমীদারী চাল চলনে চলিতে হইবে, মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা তাঁহাতে সুতরাং বলবতী হইবে। আবার যাঁহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজানা আদায় করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক। আমরা সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হইবে। ইঁহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া, তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাঁহাদিগকে লাভ পোষাইয়া লইতে হইবে। মধ্যবর্ত্তী তালুকের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের অজ্ঞাতে, কখন বা অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোনরূপ পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না।

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না।

যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারদের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রথ্যা, অতিথিশালা ইত্যাদির সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদিগের দেশের লোকের জন্য যে ভিন্ন জাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারদের ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিএশন্—জমীদারদের সমাজ। তদ্দ্বারা দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না বা হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা করা অতি অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা

যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমীদারদিগেরই হাত। যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রসংশোধনজন্য যত্ন করেন। জমীদারসম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না—জনসমাজকে জানাইতেছি না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাঁহাদের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্য্যকরী। যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্য্যে বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসীদিগের মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্য্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারদিগের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত, সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে, অনেক দুর্বৃত্ত জমীদার দুর্ব্বৃত্তি ত্যাগ করিবে। এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার জন্য আমরা ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিএশন্‌কে অনুরোধ করি। যদি তাঁহারা কুচরিত্র জমীদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবে। এবং তাঁহাদিগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে। এ কাজ না হইলে, বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলের কোন ভরসা নাই। যাঁহা হইতে এই কার্য্যের সূত্রপাত হইবে, তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইবেন। কি উপায়ে এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধারিত করা কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষগণ যে এ বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। তাঁহারা সুশিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বহুদর্শী, এবং কার্য্যক্ষম। তাঁহারা ঐকান্তিকচিত্তে যত্ন করিলে অবশ্য উপায় স্থির হইতে পারে। আমরা যাহা কিছু এ বিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাঁহাদিগের দ্বারা সুচারু প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারিবে বলিয়াই আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিলাম না। যদি আবশ্যক হয়, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা আইসে, তাহা বলিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে কেবল এই বক্তব্য যে, তাঁহারা যদি এ বিষয়ে অনুরাগহীনতা দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও অখ্যাতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাকৃতিক নিয়ম

আমরা জমীদারের দোষ দিই বা রাজার দোষ দিই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দ্দশা আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের

অবনতি ধারাবাহিক; যত দিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় তত দিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের দুর্দ্দশার সূত্রপাত। পাশ্চাত্যেরা কথায় বলেন, একদিনে রোমনগরী নির্ম্মিতা হয় নাই। এ দেশের কৃষকদিগের দুর্দ্দশাও দুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। আমরা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি, হিন্দুরাজার রাজ্যকালে রাজা কর্ত্তৃক প্রজাপীড়ন হইত না; কিন্তু তাহাতে এমন বুঝায় না যে, তৎকালে প্রজাদিগের বিশেষ সৌষ্ঠব ছিল। এখন রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ অনেক জমীদারে প্রজাপীড়ন করেন; তখন আর এক শ্রেণীর লোকে পীড়িত করিত। তাহারা কে, তাহা পশ্চাৎ বলিতেছি। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বঙ্গদেশের কৃষকের অবস্থানুসন্ধানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু অদ্য যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা যত দূর বঙ্গদেশের প্রতি বর্ত্তে, সমুদায় ভারতবর্ষের প্রতি তত দূর বর্ত্তে। বঙ্গদেশে তৎসমুদায়ের যে ফল ফলিয়াছে, সমগ্র ভারতে সেই ফল ফলিয়াছে। বঙ্গদেশ ভারতের একটি খণ্ডমাত্র বলিয়া তথায় সেই ফল ফলিয়াছে। এবং সেই ফল কেবল কৃষিজীবীর কপালেই ফলিয়াছে, এমত নহে; শ্রমজীবিমাত্রেই সমভাগে সে ফলভোগী। অতএব আমাদিগের এই প্রস্তাব, ভারতীয় শ্রমজীবী প্রজামাত্র সম্বন্ধে অভিপ্রেত বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষিজীবী এত অধিক যে, অন্য শ্রমজীবীর অস্তিত্ব এ সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা সমান।

জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বক্‌ল্ কর্ত্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। বক্‌ল্ বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না। কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অতিশয় শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিদ্যালোচনায় রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক। বিদ্যালোচনার পূর্ব্বে উদরপোষণ চাই; অনাহারে কেহই জ্ঞানালোচনা করিবে না। যদি সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবেন। অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাঁহারা বসিয়া বিদ্যালোচনা করিবেন। যদি শ্রমজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাদ্যোৎপন্ন করে, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না। কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবীদের সেবায় যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্দ্বারা শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব। উৎপাদকের

খাইয়া পরিয়া যাহা রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্ব্বে প্রথমে আবশ্যক—সামাজিক ধনসঞ্চয়।

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশবিশেষে আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্ব্বরতা। যে দেশের ভূমি উর্ব্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোষ্ণতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার আবশ্যক। এই কথা কতকগুলিন স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই। আমরা এতদংশ বক্‌লের গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়া লিখিতেছি; কৌতূহলাবিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থে দেখিবেন যে, যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বক্‌ল্ এই বলেন যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যকতা হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্য অধিক আবশ্যক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্লজনের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্ব্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে কার্ব্বন্ অধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাদিতেই অধিক কার্ব্বন্। অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক—বনজের অধিক আবশ্যক। বনজ সহজে প্রাপ্য—কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশু দুর্লভ। অতএব উষ্ণ দেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। খাদ্য সুলভ বলিয়া শীঘ্র ধনসঞ্চয় হয়।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ এবং তথায় ভূমিও উর্ব্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্ব্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ধনাধিক্য হেতু একটি সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হইতে অবসর লইয়া জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অর্জ্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা। পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিতেছি।

কিন্তু এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃষ্টের মূল। যে যে নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না,—সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশা ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন। বালতরু ফলবান্ হওয়া ভাল নহে।

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার

আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ; সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রম করে। তাহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ উহারা শ্রমোপজীবীর অর্জ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জমে। অতএব সমাজের যে অতিরিক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে। তবে দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়,—এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্যুপজীবীর। প্রথম ভাগ "মজুরির বেতন," দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের "মুনাফা"।[১] আমরা "বেতন" ও "মুনাফা," এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। "মুনাফা" বুদ্ধ্যুপজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপজীবীরা "বেতন" ভিন্ন "মুনাফা"র কোন অংশ পায় না। শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি "বেতন," সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, "মুনাফা"র মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না।

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ "বেতন," পঞ্চাশ লক্ষ "মুনাফা"। মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা "বেতন," পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মুদ্রা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ ঐ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর পঁচিশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই ঐ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা "মুনাফা," তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং ঐ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ দুই মুদ্রার পরিবর্ত্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু দুই মুদ্রাই ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই তাহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দুর্দ্দশা হইবে।

যদি ঐ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোটি মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের দুই টাকা করিয়া কুলাইত।

---

১. "ভূমির কর" এবং "সুদ" ইহার অন্তর্গত, এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনও বৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি—যথা, ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। আর যদি এই দুইয়ের একও না ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধি অপেক্ষা লোকসংখ্যাবৃদ্ধি অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের দুর্দ্দশা। ভারতবর্ষে প্রথমোদ্যমেই তাহাই ঘটিল।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। তাহার একটি একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষ্যের দুর্দ্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার সদুপায় আছে। প্রকৃত সদুপায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরন্তু যে পরিমাণে প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিঘ্ন আছে। অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়ান্তর দুইটি মাত্র। এক উপায়, দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত দেশের লোক কতক শেষোক্ত দেশে যাউক,—তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। এইরূপে ইংলণ্ডের মহদুপকার হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশসকলেরও মঙ্গল হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপায়, বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দ লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকানির্ব্বাহের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে বিবাহপ্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না।

ভারতবর্ষে এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে নাই। উষ্ণতা শরীরের শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তিদায়ক। দেশান্তরে গমন উৎসাহ, উদ্যোগ, এবং পরিশ্রমের কাজ। বিশেষ, প্রকৃতিও তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত, এবং বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্রমধ্যস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ, এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের এইরূপ সামান্য ঔপনিবেশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে।

বিবাহপ্রবৃত্তি দমন বিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটি আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক, না হউক, ক্ষুধা-নিবৃত্তি এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি সুলভ। এমত অবস্থায় পরিবার

প্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্তিদমনে প্রজা পরাঙ্মুখ হইল। প্রজাবৃদ্ধির নিবারণের কোন উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উর্ব্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতাহেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ সৃষ্টি হইল। উভয়ই অলঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল।

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দ্দশার আরম্ভ। কিন্তু একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই, সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম, ধনের তারতম্য—তৎফলে অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বেই শূদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল।

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য্য দেখা যায়।

১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ত্রিবিধ।

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দরিদ্রতা।

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেন না, যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা।

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব।

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব।

২। ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ। যদি বলি যে, ধনলিপ্সা সভ্যতাবৃদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত মনুষ্যহৃদয়ের দুইটি বৃত্তি; প্রথম জ্ঞানলিপ্সা, দ্বিতীয় ধনলিপ্সা। প্রথমোক্তটি মহৎ এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু "History of Rationalism in Europe" নামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে ধনলিপ্সাই মনুষ্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানলিপ্সা কাদাচিৎক, ধনলিপ্সা সর্ব্বসাধারণ; এ জন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া সামাজিক ধনলিপ্সা কমে না। সর্ব্বদাই নূতন নূতন সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পূর্ব্বে যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যক বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং সুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি

হইতে থাকে। অতএব সুখস্বচ্ছন্দের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্য সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হয়। উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছাও থাকে না, তৎপ্রতি যত্নও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির নিবারণকারিণী প্রবৃত্তিসকলের অভাব হয়। অতএব যে ''সন্তোষ'' কবিদিগের অশেষ প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল।

লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তুষ্টভাব, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক নিয়মগুণে সহজেই ঘটিল। এ দেশে তাপের কারণ অধিক কাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহ্য। তৎকারণ পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উষ্ণদেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুদ্ভবের আবশ্যকতা হয় না বলিয়া, তথাকার লোকে যে মৃগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্য্যতৎপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি মূল, পূর্ব্বকালীন তাদৃক্ অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্য এবং অনুৎসাহ। অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দ্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রহিল। উদ্যমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্ত সিংহের মুখে আহার্য্য পশু স্বতঃপ্রবেশ করে না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা, হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, ঐহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক ঐহিক সুখে অনাদরতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহস্র বৎসর মনুষ্যের ঐহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালিতে প্রাচীন যুনানী সাহিত্য, যুনানী দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন ঐহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে ঐ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তৃক যে নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল; আবার সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থাজন্যা নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীভূতা হইল।

৩। এই সকল কারণে শ্রমোপজীবীদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন

এক তাণ্ড দুগ্ধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমন সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দ্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দ্দশা জন্মে।

(ক) উপজীবিকানুসারে প্রাচীন আর্য্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। শূদ্র অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই দুর্দ্দশার কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যক সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশের বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের অভাববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদিগের অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব যে দেশে লোক অভাবশূন্য, নিজশ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বণিক্‌দিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ কি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উর্ব্বরভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্যবাহুল্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,—অতি প্রাচীন কালেই যে সম্ভাবনা ছিল,—তাহার কিছুই হয় নাই। অদ্য কয়েক বৎসর তাহার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। বাণিজ্যহানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা—ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই।

(খ) ক্ষত্রিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজঃ এবং রাজপ্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসুখরত, কার্য্যে শিথিল, এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের ঐরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জ্জনে ব্যগ্র, এবং সন্তুষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারতকীর্ত্তিত বলশালী, ধর্ম্মিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়জয়ী রাজচরিত্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহীন, ইন্দ্রিয়পরবশ, স্ত্রৈণ, অকর্ম্মঠ দশাপ্রাপ্ত হইয়া, শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার দুর্ম্মতি দেখিলে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। বিরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি। রাজপুরুষগণ অনর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিরোধে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে। নিত্য মল্লযুদ্ধে বল বাড়ে। বিরোধে মানসিক গুণসকলের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হয়। নির্ব্বিরোধে তৎসমুদায়ের লোপ। শূদ্রের দাসত্বে ক্ষত্রিয়ের ধন এবং

ধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে প্লিবিয়ান্‌দিগের বিবাদে, ইংলণ্ডের কমন্‌দিগের বিবাদে প্রভুদিগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল।

(গ) ব্রাহ্মণ। যেমন অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রভুত্ব বাড়িয়া পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রূপ। অপর তিন বর্ণের অনুন্নতিতে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শক্তিহানি হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত উপধর্ম্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ব্বল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়। উপধর্ম্ম ভীতজাত ; এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্ম্ম। অতএব অপর বর্ণত্রয়, মানসিকশক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্ম্মপীড়িত হইল ; ব্রাহ্মণেরা উপধর্ম্মের যাজক ; সুতরাং তাঁহাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল—নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি ঊর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এ দিকে রাজশাসনপ্রণালী দণ্ডবিধি দায় সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। "আমরা যেরূপে বলি, সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বসিবে, সেইরূপে হাঁটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে, সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাঁদিবে ; তোমার জন্মমৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না ; যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদিগকে দক্ষিণা দিও।" জালের এইরূপ সূত্র।[১] কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয় ; কেন না, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয় ; বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। পৌরাবৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতার প্রয়োজনাতিরিক্ত রোধ করিলে সমাজের অবনতি হয়। হিন্দুসমাজের অবনতির অন্য যত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভোগী। নিয়ম-জালে জড়িত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি লুপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকারণ, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছিলেন, তিনি বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরববোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাহ্মণদিগের মানস ক্ষেত্র মরুভূমি হইল।

আমরা দেখাইলাম যে, দুইটি প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষের শ্রমোপজীবীদের চিরদুর্দ্দশা। প্রথম ভূমির উর্ব্বরতাধিক্য, দ্বিতীয় বায়ব্বাদির তাপাধিক্য। এই দুই কারণে

১. **টাকাটার উল্টা পিঠ** আমি ধর্ম্মতত্ত্বে দেখাইয়াছি। উভয় মতই সত্যমূলক।

অতি পূর্ব্বকালেও ভারতবর্ষের সভ্যতার উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল কারণে বেতন অল্প হইয়া উঠিল। এবং গুরুতর সামাজিক তারতম্য উপস্থিত হইল। ইহার পরিণাম, প্রথম, শ্রমোপজীবীদিগের (১) দারিদ্র্য, (২) মূর্খতা, (৩) দাসত্ব। দ্বিতীয়, এই দশা একবার উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মবলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল। তৃতীয়, সেই দুর্দ্দশা ক্রমে সমাজের অন্য সকল সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল। এক স্রোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, একত্রে নিম্নভূমে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি এ সকল অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীৎকার করিয়া ফল কি? রাজা ভাল আইন করিলে কি ভারতবর্ষ শীতল দেশ হইবে, না জমীদার প্রজাপীড়নে ক্ষান্ত হইলে ভূমি অনুর্ব্বরা হইবে? উত্তর, আমরা যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা নিত্য নহে। অথবা এইরূপ নিত্য যে, যদি অন্য নিয়মের বলে প্রতিরুদ্ধ না হয়, তবেই তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঐ সকল ফলোৎপত্তি কারণান্তরে প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে। সে সকল কারণ, রাজা ও সমাজের আয়ত্ত। যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালীতে গ্রীক সাহিত্যাদির আবিষ্ক্রিয়া না হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু জলবায়ুর শীতোষ্ণতা বা ভূমির উর্ব্বরতা বা অন্য বাহ্য প্রকৃতির কোন কারণের কিছু পরিবর্ত্তন হইত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আইন

বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিদ্র—অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমীদারের দোষ নহে। কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে নহে। জমীদারের দোষ, প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, রাজবিধির দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে। দুর্ব্বলের উপর পীড়ন করা বলবানের স্বভাব। সেই পীড়ন নিবারণ জন্যই রাজত্ব। রাজা বলবান্ হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করেন, ইহারই জন্য মনুষ্যের রাজশাসনশৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার আবশ্যকতা। যদি কোন রাজ্যে দুর্ব্বলকে বলবানে পীড়ন করে, তবে তাহা রাজারই দোষ। সে রাজ্যে রাজা আপন কর্ত্তব্য সাধনে হয় অক্ষম, নয় পরাঙ্মুখ। যদি এ দেশে জমীদারে কৃষককে পীড়িত করেন, ইহা সত্য হয়, তবে তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অবশ্য দোষ আছে। দেখা যাউক, তাঁহারা আপন কর্ত্তব্য সাধন পক্ষে কি করিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজারা ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইত; কেহ তাহাদিগকে মাঙ্গন মাথট পার্ব্বণীর জন্য জ্বালাতন করিত না। হিন্দুরা স্বজাতির রাজ্যকালের পুরাবৃত্ত লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য অন্যবিষয়ক গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত

হওয়া যায়। তদ্দ্বারা জানা যায় যে, হিন্দুরাজ্যকালে প্রজাপীড়ন ছিল না। যাঁহারা মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ের প্রজাপীড়ন এবং বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বিবেচনা করেন যে, প্রাচীন হিন্দুরাজগণও এইরূপ প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থমধ্যে প্রজাপীড়নের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। যদি প্রজাপীড়নের প্রাবল্য থাকিত, তবে অবশ্য দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যাদিতে তাহার চিহ্ন থাকিত; কেন না, সাহিত্য এবং স্মৃতি সমাজের প্রতিকৃতি মাত্র। প্রজাপীড়ন দূরে থাকুক, বরং সেই প্রতিকৃতিতে দেখা যায় যে, হিন্দু রাজারা বিশেষ প্রজাবৎসল ছিলেন। রাজা পিতার ন্যায় প্রজাপালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। সুতরাং অন্যান্য জাতীয় রাজাদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহাদের গৌরব। যুনানী রাজগণের নামই ছিল "Tyrant", সে শব্দের আধুনিক অর্থ প্রজাপীড়ক। ইংলণ্ডীয় রাজগণ প্রজাপীড়ক বলিয়া প্রজাদিগের সহিত তাঁহাদিগের বিবাদ হইত; একজন রাজা প্রজাকর্ত্তৃক পদচ্যুত, অন্য একজন নিহত হন। ফ্রান্স্ প্রজাপীড়নের জন্যই বিখ্যাত, এবং অসহ্য প্রজাপীড়নের জন্যই ফরাসীবিপ্লবের সৃষ্টি। ভারতবর্ষে উত্তরগামী মুসলমান এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রজাপীড়নের উল্লেখ মাত্র যথেষ্ট। কেবল প্রাচীন হিন্দু রাজগণের এ বিষয়ে বিশেষ গৌরব। তাঁহারা কেবল ষষ্ঠাংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।

মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজ্যশাসনে সুপারগ ছিলেন না। যেখানে হিন্দু রাজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা এক প্রকার কর-সংগ্রহের কণ্ট্রাক্টর হইলেন। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমীদারীর সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি। এই কণ্ট্রাক্টরেরাই জমীদার। রাজার রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করিতে পারেন, ততই তাঁহাদের লাভ। সুতরাং তাঁহারা প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন। প্রজার যে সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য।

তাহার পর ইংরাজেরা রাজা হইলেন। তাঁহারা যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন তাহাদিগের সেই অবস্থা। তাহাদিগের দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরাজদিগের ইচ্ছার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু লর্ড্ কর্ণওয়ালিস্ মহাভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরও গুরুতর সর্ব্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জমীদারদিগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়াই জমীদারীতে তাঁহাদিগের যত্ন হইতেছে না। জমীদারীতে তাঁহাদিগের স্থায়ী অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাঁহাদের যত্ন হইবে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাপীড়ক না হইয়া প্রজাপালক হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজস্বের কণ্ট্রাক্টর্‌দিগকে ভূস্বামী করিলেন।

তাহাতে কি হইল ? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী ; জমীদারেরা কস্মিন্ কালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণ্‌ওয়ালিস্ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—কস্মিন্ কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী ; কেন না, এ বন্দোবস্ত "চিরস্থায়ী।"

কর্ণ্‌ওয়ালিস্ প্রজাদিগের হাত পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন—জমীদার কর্ত্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না। কেবল বলিলেন যে, "প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনেরল্ যে সকল নিয়ম আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তাহা যখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিবেন, তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতির খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।"[১]

"বিধিবদ্ধ করিবেন" আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজারা পুরুষানুক্রমে জমীদার কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজ কিছুই করিলেন না। প্রজাদিগের দ্বিতীয় বার অশুভ গ্রহ। ১৮১৯ সালে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্ লিখিলেন, "যদিও সেই বন্দোবস্তের পর এত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি আমরা তৎকালে প্রজাদিগের স্বত্ব নিরূপণ এবং সামঞ্জস্য করিবার যে অধিকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুযায়ী অদ্যাপি কিছুই করা হইল না।" এই আক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ১৮৩২ সালে কাম্বেল্ নামক এক জন বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী লিখিলেন, "এ অঙ্গীকার অদ্যাপি রাজকীয় ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট্ ভ্রাম্য ভূস্বামী(প্রজা)দিগের অগ্রে জমীদারকে দাঁড় করাইয়া, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উচ্ছেদ করিয়াছেন। সুতরাং সে অঙ্গীকার মত কর্ম্ম করেন নাই।"

বরং তদ্বিপরীতই করিলেন। দুর্ব্বলকে আরও দুর্ব্বল করিলেন, বলবান্‌কে আরও বলবান্ করিলেন। ১৮১২ শালের ৫ আইনের দ্বারা প্রজার যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা লোপ করিলেন। এই বিধি হইল যে, জমীদার প্রজাকে যে-কোন হারে পাট্টা দিতে পারিবেন। ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে-কোন প্রজার নিকট, যে-কোন হারে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন। ডিরেক্টরেরা স্বয়ং এই অর্থ করিলেন,[২] সুতরাং কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখা জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল। ভূমির সঙ্গে কৃষকের কোন সম্বন্ধ রহিল না ! কৃষক মজুর হইল। এই তৃতীয় কুগ্রহ।

---

১. ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৮ ধারা।

২. Revenue Letter to Bengal, 9th May, 1821, Para 54.

এই ১৮১২ শালের ৫ আইন পূর্ব্বকালের বিখ্যাত "পঞ্চম"। যদি কেহ প্রজার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহিত, সে "পঞ্চম" করিত। এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে নামটি নাই। "কোরোক" কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি। সন ১৮১২ শালের ৫ আইনও কোরোকের প্রথম আইন নহে। যে বৎসর জমীদার প্রথম ভূস্বামী হইলেন, সেই বৎসর কোরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল।[১] জমীদার চিরকালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরাজেরা প্রথমে সে দস্যুবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করিলেন। অদ্যাপি এই দস্যুবৃত্তি আইনসঙ্গত। প্রজাদিগের এই চতুর্থ কপালের দোষ।

পরে ১৮১২ শালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্দ্বারা আরও স্পষ্টীকৃত হইল। ডিরেক্টরেরা লিখিলেন যে, এই আইন অনুসারে জমীদারেরা কদিমী প্রজাদিগকেও নিরিকের বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন।[২]

তাহার পর সন ১৮৫৯ শাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ শালে বিখ্যাত দশ আইনের সৃষ্টি হইল। ইংরাজ কর্তৃক প্রজার উপকারার্থ এই প্রথম নিয়মসংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ শালে কর্ণওয়ালিস্ যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ বৎসর পরে প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড কানিঙ্ হইতে প্রথম তাহার কিঞ্চিৎমাত্র পূরণ হইল। সেই পূরণ প্রথম, সেই পূরণই শেষ।[৩] তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৬৯ শালের ৮ আইন দশ আইনের অনুলিপিমাত্র।[৪]

১৮৫৯ শালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা বলি না। প্রজাদিগের যাহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহাদিগের উপর যে সকল অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের বিশেষ কোন উপায়, এই আইন বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হয় নাই। কোরোক-লুটের বিধি সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ, প্রজার খাজানা বাড়াইবার বিশেষ সুপথ হইয়াছে। এ আইনের সাহায্যে যাহার হার বেশী করা যাইতে পারে না, বঙ্গদেশে এমত কৃষক অতি অল্পই আছে।

তথাপি এইটুকু মাত্র প্রজার পক্ষতা দেখিয়া প্রজাদ্বেষী, স্বার্থপর কোন কোন জমীদার কতই কোলাহল করিয়াছিলেন! অদ্যাপি করিতেছেন!

---

১. সন ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ২ ধারা।

২. Revenue Letter, 9th May, 1821, Para 54.

৩. যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন নতুন Tenancy Act প্রচারিত হয় নাই।

৪. এই সকল তত্ত্ব যাঁহারা সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্গীয় প্রজা" (Bengal Ryot) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমরা এ প্রবন্ধের এ অংশের কতক কতক সেই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়াছি।

আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ্ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতি বারে দুর্ব্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক বলবান্ জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমীদার প্রজাপীড়ন না করিবেন কেন ?

ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রিটিশ্ রাজপুরুষেরা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহারা প্রজার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। দেওয়ানী পাইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়, এবং ইহাই তাঁহাদিগের চেষ্টা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা বিদেশী ; এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন, সুতরাং পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভ্রমে পতিত হইয়া এই মহৎ অনিষ্টকর বিধি সকল প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমবশতই হউক, আর যে কারণেই হউক, প্রজাপীড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কথা আছে। ইংরাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—সে প্রতাপে সমগ্র আসিয়াখণ্ড সঙ্কুচিত ; তবে ক্ষুদ্রজীবী জমীদারের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় না কেন ? বহুদূরবাসী আবিসিনিয়ার রাজা জন কয়েক ইংরাজকে পীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য লোপ হইল। আর রাজপ্রতিনিধির অট্টালিকার ছায়াতলে লক্ষ লক্ষ প্রজার উপর পীড়ন হইতেছে, তাহার কোন প্রতীকার হয় না কেন ? জমীদার প্রজা ধরিয়া অনিতেছেন, কয়েদ করিতেছেন, মারিয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার ফশল লুটিতেছেন, ভূমি কাড়িয়া লইতেছেন, সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন, তাহার প্রতীকার হয় না কেন ? কেহ বলিবেন, তাহার জন্য রাজপুরুষেরা আইন করিয়াছেন, আদালত করিয়াছেন, তবে গবর্ণমেণ্টের ত্রুটি কি ? আমরাও সেই কথা জিজ্ঞাসা করি। আইন আছে—সে আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হয় না কেন ? আদালত আছে—সে আদালতে দোষী জমীদার চিরজয়ী কেন ? ইহার কি কোন উপায় হয় না ? যে আইনে কেবল দুর্ব্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না—সে আইন আইন কিসে ? যে আদালতের বল কেবল দুর্ব্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত কিসে ? শাসনদক্ষ ইংরাজেরা কি ইহার কিছু সুবিধি করিতে পারেন না ? যদি না পারেন, তবে কেন শাসনদক্ষতার গর্ব্ব করেন ? যদি পারেন, তবে মুখ্য কর্ত্তব্য সাধনে অবহেলা করেন কেন ? আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য তাঁহাদিগের নিকট যুক্তকরে রোদন করিতেছি—তাঁহাদের মঙ্গল হউক !—ইংরাজরাজ্য অক্ষয় হউক !—তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

কেন যে আইন আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার একটি কারণ আমরা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিব।

প্রথমতঃ, মোকদ্দমা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কি প্রকার ব্যয়, তাহার উদাহরণ আমরা দ্বিতীয় সংখ্যায় দিয়াছি, পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। যাহা ব্যয়সাধ্য,

তাহা দরিদ্র কৃষকদিগের আয়ত্ত নহে। সুতরাং তাহারা তদ্দ্বারা সচরাচর উপকৃত হয় না ; বরং তদ্বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। জমীদার ধনী, আদালতের খেলা তিনি খেলিতে পারেন। দোষে হউক, বিনা দোষে হউক, তিনি ইচ্ছা করিলেই কৃষককে আদালতে লইয়া উপস্থিত করেন। তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং কৃষকের দুর্দ্দশা ঘটে, অতএব আইন আদালত, কৃষককে পীড়িত করিবার, ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, আদালত প্রায় দূরস্থিত। যাহা দূরস্থ, তাহা কৃষকের পক্ষে উপকারী হইতে পারে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাষ প্রভৃতি ছাড়িয়া দূরে গিয়া বাস করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারে না। ব্যয়ের কথা দূরে থাকুক, তাহাতে ইহাদের অনেক কার্য্য ক্ষতি হয়, এবং অনেক অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। কৃষক গোমস্তার নামে নালিশ করিতে গেল, সেই অবসরে গোমস্তার বাধ্য লোকে তাহার ধান চুরি করিয়া লইয়া গেল, না হয় আর একজন কৃষক গোমস্তার নিকট হইতে পাট্টা লইয়া তাহার জমীখানি দখল করিয়া লইল। তদ্ভিন্ন আমাদিগের দেশের লোক, বিশেষ ইতর লোক অত্যন্ত আলস্যপরবশ। শীঘ্র নড়ে না, সহজে উঠে না, কোন কার্য্যেই তৎপরতা নাই। দূরে যাইতে চাহে না। কৃষক বরং জমীদারের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবে, তথাপি দূরে গিয়া তাহার প্রতীকার করিতে চাহে না। যাঁহারা বিচারকার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের বিচারালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানেরই মোকদ্দমা অনেক ; দূরের মোকদ্দমা প্রায় হয় না। অতএব বিচারক নিকটে থাকিলে যে অত্যাচারের শাসন হইত, দূরে থাকায় সে অত্যাচারের শাসন হয় না। ইহার আর একটি ফল এই হইয়া উঠিয়াছে যে, অত্যাচারী গোমস্তারাই বিচারকের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। যখন এক জন কৃষক অপরের উপর দৌরাত্ম্য করে, তখন তাহার নালিশ জমীদারের গোমস্তার কাছে হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, তাহার নালিশ হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং পরপীড়ক, এবং চারি পয়সার লোভে সকল প্রকার অত্যাচার করিতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বিচারকার্য্য থাকায় দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বুদ্ধিমানে বুঝিবেন।

তৃতীয়তঃ, বিলম্ব। সকল আদালতেই মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়। বিলম্বে যে প্রতীকার, সে প্রতীকারকে প্রতীকার বলিয়া বোধ হয় না। গোমস্তায় কৃষকের ধান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, কৃষক আদালতে ক্ষতিপূরণের জন্য নালিশ করিল। যদি বড় কপাল-জোরে সে ডিক্রী পাইল, তবে সে এক বৎসরে। আপীলে আর এক বৎসর। যদি আত্যন্তিক সৌভাগ্যগুণে আপীলে ডিক্রী টিকিল, এবং ডিক্রীজারিতে টাকা আদায় হইল, তবে সে আর এক বৎসরে। বাদীর কুড়ি টাকার ধান ক্ষতি হইয়াছিল, ডিক্রীজারি করিয়া খরচ খরচা বাদে তিন বৎসর পরে পাঁচ টাকা আদায় হইল। এরূপ প্রতীকারের আশায় কোন্ কৃষক জমীদারের নামে নালিশ করিবে?

বিলম্বে বিচারকের দোষ নাই। আদালতের সংখ্যা অল্প—যেখানে তিন জন বিচারক হইলে ভাল হয়, সেখানে একজন বৈ নাই। সুতরাং মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে বিলম্ব

ঘটিয়া যায়। আর প্রচলিত আইন অত্যন্ত জটিল। বিচারপ্রণালীতে অত্যন্ত লিপিবাহুল্যের এবং অত্যন্ত কার্য্যবাহুল্যের আবশ্যকতা। আজ এ মোকদ্দমার প্রতিপক্ষের উকীলের জেরার বাহুল্যে একটি মোকদ্দমার একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল ; সুতরাং আর পাঁচটি মোকদ্দমার কিছু হইল না, আর এক মাস বাদে তাহার দিন পড়িল। কাল নিষ্পন্নযোগ্য মোকদ্দমার একটি নিষ্প্রয়োজনীয় সাক্ষী অনুপস্থিত, তাহার উপর দস্তক করিতে হইল। সুতরাং মোকদ্দমা আর এক মাস পিছাইয়া গেল। এ সকল না করিলে, বিচার আইনসঙ্গত হয় না। নিষ্পত্তি আপীলে টিকে না। বিচারে বিলম্ব হয়, তাহাও স্বীকার,—অবিচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি কলিকাতার তৈয়ারি আইন ঘুণাক্ষরে লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। ইংরাজি আইনের মর্ম্ম এই।

আমরা যে সভ্য হইতেছি, দিন দিন যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহার একটি পরিচয়। আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে। জাহাজে আমদানী হইয়া, চাঁদপালের ঘাটে ঢোলাই হইয়া, কলিকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারীরা আপন আপন পণ্যদ্রব্যের প্রশংসা করিতে করিতে অধীর হইতেছেন। গলাবাজির জোরে, আগে যাঁহাদের অন্ন হইত না, এখন তাঁহারা বড় লোক হইতেছেন। দেশের শ্রীবৃদ্ধির আর সীমা নাই, সর্ব্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে। আর কেহ বেআইনি করিয়া সুবিচার করিতে পারে না। তাহাতে দীন দুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহারা আইনের গৌরব বুঝে না, সুবিচার চায়। সে কেবল তাহাদিগের মূর্খতাজনিত ভ্রম মাত্র।

মনে কর, গোমস্তা, কি অপর কেহ কোন দুঃখী প্রজার উপর কোন গুরুতর দৌরাত্ম্য করিল। গোমস্তা সেশ্যনের বিচারে অর্পিত হইল। সেশ্যনের বিচারে সাক্ষীদিগের সত্য কথায় প্রতিবাদীর অপরাধ প্রমাণ হইল। কিন্তু বিচার জুরির হাতে। জুরর মহাশয়েরা এ কাজে নূতন ব্রতী ; প্রমাণ অপ্রমাণ কিছু বুঝেন না। যখন সাক্ষীর জোবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাঁহারা কেহ কড়ি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের দেনা পাওনা মনে মনে নিকাশ করিতেছিলেন, কেহ বা অল্প তন্দ্রাভিভূত। উকীল যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা কিঞ্চিৎ ক্ষুধাতুর, গৃহে গৃহিণী কিরূপ জলযোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন দুর্বোধ্য বাঙ্গালায় "চার্য্য" দিতেছিলেন, তখন তাঁহারা মনে মনে জজ সাহেবের দাড়ির পাকা চুলগুলিন গণিতেছিলেন। জজ সাহেব যে শেষে বলিলেন, "সন্দেহের ফল প্রতিবাদী পাইবে," তাহাই কেবল কানে গেল। জুরর মহাশয়দিগের সকলই সন্দেহ—কিছুই শুনেন নাই, কিছুই বুঝেন নাই ; শুনিয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, হয় ত সে শক্তিও নাই, সুতরাং সন্দেহের ফল প্রতিবাদীকেই দিলেন। গোমস্তা মহাশয়

খালাস হইয়া আবার কাছারিতে গিয়া জমকিয়া বসিলেন। ভয়ে বাদী সবংশে ফেরার হইল। যাহারা দোষীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, গোমস্তা তাহাদের ভিটামাটি লোপ করিলেন। আমরা বড় সন্তুষ্ট হইলাম—কেন না, জুরির বিচার হইয়াছে—বিলাতি প্রথানুসারে বিচার হইয়াছে—আমরা বড় সভ্য হইয়া উঠিয়াছি।

বর্ত্তমান আইনের এইরূপ অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা অবিচারের চতুর্থ কারণ।

পঞ্চম কারণ, বিচারকবর্গের অযোগ্যতা। এ দেশের প্রধানতম বিচারকেরা সকলেই ইংরাজ। ইংরাজেরা সচরাচর কার্য্যদক্ষ, সুশিক্ষিত, এবং সদনুষ্ঠাতা। কিন্তু তাহা হইলেও বিচারকার্য্যে তাঁহাদিগের তাদৃশ যোগ্যতা নাই। কেন না, তাঁহারা বিদেশী, এ দেশের অবস্থা তাদৃশ অবগত নহেন, এ দেশের লোকের চরিত্র বুঝেন না, তাহাদিগের সহিত সহৃদয়তা নাই, এবং অনেকে এ দেশের ভাষাও ভাল করিয়া বুঝেন না। সুতরাং সুবিচার করিতে পারেন না, বিচারকার্য্যের জন্য যে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক, তাহা অনেকেরই হয় নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অধিকাংশ মোকদ্দমাই অধস্তন বিচারকের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ অধস্তন বিচারকই এ দেশীয়,—তবে উপরিস্থ জন কতক ইংরাজ বিচারকের দ্বারা অধিক বিচারহানি সম্ভবে না। ইহার উত্তর, প্রথমতঃ, সকল বাঙ্গালী বিচারকই বিচারকার্য্যের যোগ্য নহেন। বাঙ্গালী বিচারকের মধ্যে অনেকে মূর্খ, স্থূলবুদ্ধি, অশিক্ষিত, অথবা অসৎ। এ সম্প্রদায়ের বিচারক সৌভাগ্যক্রমে দিন দিন অল্পসংখ্যক হইতেছেন। তথাপি বিশেষ সুযোগ্য বাঙ্গালীরা বিচারক শ্রেণীভুক্ত নহেন। ইহার কারণ, এ দেশীয় বিচারকের উন্নতি নাই, পদবৃদ্ধি নাই ; যাঁহারা ওকালতি করিয়া অধিক উপার্জ্জনে সক্ষম, সে সকল ক্ষমতাশালী লোক বিচারকের পদের প্রার্থী হয়েন না। সুতরাং সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর লোক এবং অধম শ্রেণীর লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। দ্বিতীয়তঃ, অধস্তন বিচারকে সুবিচার করিলে কি হইবে? আপীলে চূড়ান্ত বিচার ইংরাজের হাতে। নীচে সুবিচার হইলেও উপরে অবিচার হয়, এবং সেই অবিচারই চূড়ান্ত। অনেক বিচারক সুবিচার করিতে পারিলেও আপীলের ভয়ে করেন না ; যাহা আপীলে থাকিবে, তাহাই করেন। এ বিষয়ে হাইকোর্ট অনেক সময় বিশেষ অনিষ্টকর। তাহারা অধস্তন বিচারকবর্গকে বিচারপদ্ধতি দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন ;—বলেন, এইরূপে বিচার করিও, এই আইনের অর্থ এইরূপ বুঝিও। অনেক সময়ে এই সকল বিধি ভ্রমাত্মক—কখন কখন হাস্যাস্পদও হইয়া উঠে। কিন্তু অধস্তন বিচারকদিগকে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। হাইকোর্টের জজদিগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন, এমন সুবর্ডিনেট জজ্, মুন্সেফ্ ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অনেক আছেন ; কিন্তু তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অবিজ্ঞদিগের নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়।

এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে পর "সমাজদর্পণ" নামে একখানি অভিনব সংবাদপত্র দৃষ্টি করিলাম। তাহাতে "বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ" এই শিরোনামে একটি প্রস্তাব

আছে, আমাদিগের এই প্রবন্ধের পূর্ব্বপরিচ্ছেদের উপলক্ষে উহা লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি ; কেন না, লেখক যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, অনেকেই সেইরূপ বিবেচনা করেন বা করিতে পারেন। তিনি বলেন,—

''একেই ত দশশালা বন্দোবস্তের চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত খনন করা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদর্শনের মত দুই এক জন সম্ভ্রান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালীর অনুমোদন বুঝিলে কি আর রক্ষা আছে ?''

আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি যে, দশশালা বন্দোবস্তের ধ্বংস আমাদিগের কামনা নহে বা তাহার অনুমোদনও করি না। ১৭৯৩ শালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যে দিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব। এবং ইংরাজেরাও এমন নির্ব্বোধ নহেন যে, এমত গর্হিত এবং অনিষ্টজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাহি যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এখন সুনিয়ম করিলে তাহার যত দূর প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই হউক। কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে, ''যাহাতে দশশালা বন্দোবস্তের কোনরূপ ব্যাঘাত না হইয়া জমীদার ও প্রজা, উভয়েরই অনুকূলে এরূপ সুব্যবস্থা সকল স্থাপিত হয় যে, তদ্দ্বারা উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্ত্তব্য।'' আমরা তাহাই চাই।

ইহাও বক্তব্য যে, আমরা কর্ণ্‌ওয়ালিসের বন্দোবস্তকে ভ্রমাত্মক, অন্যায়, এবং অনিষ্টকারক বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যে, ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় লোকদিগকে তাহাতে স্বত্ববান্ করিয়াছেন, এবং করবৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দূষ্য বিবেচনা করি না। তাহা ভালই করিয়াছেন। এবং ইহা সুবিবেচনার কাজ, ন্যায়সঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গলজনক। আমরা বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দ্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে।

লেখক আরও বলেন ;—

''আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা দেশ নিতান্ত নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে। ** সকলেই বলে, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাকিতেছে না, বিদেশীয় বণিক্ ও

রাজপুরুষেরা প্রায়ই লইয়া যাইতেছেন, যদি মহাত্মা কর্ণওয়ালিস্ জমীদারদিগের বর্ত্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।''

সাধারণতঃ অনেকেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদিগের বিবেচনায় যে কয়েকটি ভ্রম আছে, তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম।

১। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নির্ধন বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা ইতিপূর্ব্বকালে যে বাঙ্গালা দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। বরং এক্ষণে যে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ''বঙ্গদেশের কৃষকে''র প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কোন কোন প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি। তদতিরিক্ত এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই।

২। বিদেশী বণিক্ ও রাজপুরুষে দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে দেশে টাকা থাকিতেছে না, এই প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমে বিদেশীয় বণিক্দিগের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের সচরাচর তাৎপর্য্য বোধ হয়, এই যে, বণিকেরা এই দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, সুতরাং এই দেশের টাকা লইতেছেন বৈ কি? যে টাকাটা তাঁহাদের লাভ, সে টাকা, এ দেশের টাকা। বোধ হয়, ইহাই তাঁহাদের বলিবার উদ্দেশ্য।

বিদেশীয় বণিকেরা যে লাভ করেন, তাহা দুই প্রকারে; এক আমদানিতে, আর এক রপ্তানিতে। এ দেশের দ্রব্য লইয়া গিয়া দেশান্তরে বিক্রয় করেন, তাহাতে তাঁহাদের কিছু মুনাফা থাকে। দেশান্তরের দ্রব্য আনিয়া এ দেশে বিক্রয় করেন, তাহাতেও তাঁহাদের কিছু মুনাফা থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার লাভ নাই।

এ দেশের সামগ্রী লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা করেন, সহজেই দেখা যাইতেছে যে, সে মুনাফা এ দেশের লোকের নিকট হইতে লয়েন না। যে দেশে তাহা বিক্রয় করা হয়, সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মুনাফা পান। এখানে তিন টাকা মণ চাউল কিনিয়া, বিলাতে পাঁচ টাকা মণ বিক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনাফা করিলেন, তাহা এ দেশের লোককে দিতে হইল না; বিলাতের লোকে দিল। বরং এ দেশের লোকে আড়াই টাকা পড়তার চাউল তাঁহাদের কাছে তিন টাকায় বিক্রয় করিয়া কিছু মুনাফা করিল। অতএব বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশীয় সামগ্রী বিদেশে বিক্রয় করিয়া এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বরং কিছু দিয়া গেলেন।

তবে ইহাই স্থির যে, তাঁহারা যদি কিছু এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যান, তবে সে দেশান্তরের জিনিস এ দেশে বিক্রয় করিয়া তাহার মুনাফায়। বিলাতে চারি টাকার

থান কিনিয়া এ দেশে ছয় টাকায় বিক্রয় করিলেন ; যে দুই টাকা মুনাফা হইল, তাহা এ দেশের লোকে দিল। সুতরাং আপাততঃ বোধ হয় বটে যে, এ দেশের টাকাটা তাঁহাদের হাত দিয়া বিদেশে গেল। দেশের টাকা কমিল। এই ভ্রমটি কেবল এ দেশের লোকের নহে। ইউরোপের সকল দেশেই ইহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের মন আচ্ছন্ন ছিল, এবং তথায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লোকের মন হইতে ইহা অদ্যাপি দূর হয় নাই। ইহার যথার্থ তত্ত্ব এত দুরূহ যে, অল্পকাল পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। রাজগণ ও রাজমন্ত্রিগণ এই ভ্রমে পতিত হইয়া, বিদেশের সামগ্রী স্বদেশে যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেন। এবং সেই প্রবৃত্তির বশে বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রীর উপর গুরুতর শুল্ক বসাইতেন। এই মহাভ্রমাত্মক সমাজনীতিসূত্র ইউরোপে (Protection) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তদুচ্ছেদপূর্ব্বক আধুনিক অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালী (Free Trade) সংস্থাপন করিয়া ব্রাইট্ ও কব্ডেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ফ্রান্সে তাহা বিশেষরূপে বদ্ধমূল করিয়া, তৃতীয় নাপোলিয়নও প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। তথাপি এখনও ইউরোপে অনেকের এ ভ্রম দূর হয় নাই। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের যে সে ভ্রম থাকিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? Protection হইতে ইউরোপে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বক্লের গ্রন্থ পাঠ করিবেন। যিনি তাহার অসত্যতা বুঝিতে চাহেন, তিনি মিল্ পাঠ করিবেন। ঈদৃশ দুরূহ তত্ত্ব বুঝাইবার স্থান, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষ ভাগে হইতে পারে না। আমরা কেবল গোটাকত দেশী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

আমরা ছয় টাকা দিয়া বিলাতি থান কিনিলাম। টাকা ছয়টি কি অমনি দিলাম? অমনি দিলাম না,—তাহার পরিবর্ত্তে একটি সামগ্রী পাইলাম। সেই সামগ্রীটি যদি আমরা উচিত মূল্যের উপর একটি পয়সা বেশী দাম দিয়া লইয়া থাকি, তবে সেই পয়সাটি আমাদের ক্ষতি। কিন্তু যদি একটি পয়সাও বেশী না দিয়া থাকি, তবে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ছয় টাকার থানটি কিনিয়া একটি পয়সাও বেশী মূল্য দিয়াছি কি না। দেখা যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে থান আমরা কোথাও পাই না, পাইলে তাহা সাধারণ লোকে ছয় টাকায় কেন কিনিবে? যদি ছয় টাকার এক পয়সা কমে ঐ থান কোথাও পাই না, তবে ঐ মূল্য অনুচিত নহে। যে ছয় টাকায় থান কিনিল, সে উচিত মূল্যেই কিনিল। যদি উচিত মূল্যে সামগ্রীটি কেনা হইল, তবে ক্রেতাদিগের ক্ষতি কি? কি প্রকারে তাহাদিগের টাকা অপহরণ করিয়া বিদেশীয় বণিক্ বিদেশে পলায়ন করিল? তাহারা দুই টাকা মুনাফা করিল বটে, কিন্তু ক্রেতাদিগের কোন ক্ষতি করিয়া লয় নাই ; কেন না, উচিত মূল্য লইয়াছে। যদি কাহারও ক্ষতি না করিয়া মুনাফা করিয়া থাকে, তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে কাহারও ক্ষতি নাই, সেখানে দেশের অনিষ্ট কি?

আপত্তির মীমাংসা এখনও হয় নাই। আপত্তিকারকেরা বলিবেন যে, ঐ ছয়টি টাকায় দেশী তাঁতির কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশে থাকিত। ভালই। কিন্তু দেশী তাঁতির কাছে থান কই? সে যদি থান বুনিতে পারিত, ঐ মূল্যে ঐরূপ থান দিতে পারিত, তবে আমরা তাহারই কাছে থান কিনিতাম—বিদেশীর কাছে কিনিতাম না। কেন না, বিদেশীও আমাদের কাছে থান লইয়া বেচিতে আসিত না। কারণ, দেশীয় বিক্রেতা যেখানে সমান দরে বেচিতেছে, সেখানে তাহার লভ্য হইত না। এ কথাটি সমাজনীতির আর একটি দুর্ব্বোধ্য নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এক্ষণে থাক। স্থূল কথা, ঐ ছয় টাকা যে দেশী তাঁতি পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। ক্রেতাদিগের যে ক্ষতি নাই, তাহা দেখাইয়াছি। দেশী তাঁতিরও ক্ষতি নাই। সে থান বুনে না, কিন্তু অন্য কাপড় বুনিতেছে। যে সময়ে ঐ ছয় টাকার জন্য থান বুনিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় বুনিতেছে। সে কাপড় সকলই বিক্রয় হইতেছে। অতএব তাহার যে উপার্জ্জন হইবার, তাহা হইতেছে। থান বুনিয়া সে আর অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিত না; থান বুনিতে গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বুনা স্থগিত থাকিত। যেমন থানের মূল্য ছয় টাকা পাইত, তেমনি ছয় টাকা মূল্যের অন্য কাপড় বুনা হইত না; সুতরাং লাভে লোকসানে পুষিয়া যাইত। অতএব তাঁতির তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

তার্কিক বলিবেন, তাঁতির ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানির জন্য তাঁতির ব্যবসায় মারা গেল। তাঁতি থান বুনে না, ধুতি বুনে। ধুতির অপেক্ষা থান সস্তা, সুতরাং লোকে থান পরে, ধুতি আর পরে না। এ জন্য অনেক তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইয়াছে।

উত্তর। তাহার তাঁতবুনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য ব্যবসা করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া আর খাইতে পায় না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই। সকল ব্যবসায়ের পরিণাম সমান লাভ, ইহা সমাজতত্ত্ববেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন। যদি তাঁত বুনিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ হইত, তবে সে ধান বুনিয়া সেই পাঁচ টাকা লাভ করিবে। থানে বা ধুতিতে সে ছয় টাকা পাইত, ধানে সে সেই ছয় টাকা পাইবে। তবে তাঁতির ক্ষতি হইল কই?

ইহাতেও এক তর্ক উঠিতে পারে। তুমি বলিতেছ, তাঁত বুনিয়া খাইতে না পাইলেই ধান বুনিয়া খাইবে, কিন্তু ধান বুনিবার অনেক লোক আছে। আরও লোক সে ব্যবসায়ে গেলে ঐ ব্যবসায়ের লভ্য কমিয়া যাইবে; কেন না, অনেক লোক গেলে অনেক ধান হইবে, সুতরাং ধান সস্তা হইবে। যদি ধান্যকারক কৃষকদিগের লাভ কমিল, তবে দেশের টাকা কমিল বই কি?

উত্তর। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। এক পক্ষে বাণিজ্য হয় না। যেমন আমরা বিলাতের কতক সামগ্রী লই, তেমনি বিলাতের লোকে আমাদিগের কতক সামগ্রী লয়। যেমন আমরা কতকগুলিন বিলাতী সামগ্রী লওয়াতে, আমাদের দেশে প্রস্তুত সেই সেই

সামগ্রীর প্রয়োজন কমে, সেইরূপ বিলাতীয়েরা আমাদের দেশের কতকগুলি সামগ্রী লওয়াতে আমাদের দেশের সেই সেই সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ে। যেমন ধুতির প্রয়োজন কমিতেছে, তেমনি চাউলের প্রয়োজন বাড়িতেছে। অতএব যেমন কতকগুলি তাঁতির ব্যবসায়হানি হইতেছে, তেমনি কৃষি ব্যবসায় বাড়িতেছে, বেশী লোকের চাষ করিবার আবশ্যক হইতেছে। অতএব চাষীর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের লাভ কমিবে না।

অতএব ব্যাণিজ্য হেতু যাহাদের পূর্ব্বব্যবসায়ের হানি হয়, নূতন ব্যবসায়াবলম্বনে তাহাদের ক্ষতি পূরণ হয়। তাহা হইলে বিলাতি থান খরিদে তাঁতির ক্ষতি নাই। তাঁতিরও ক্ষতি নাই, ক্রেতাদিগেরও ক্ষতি নাই। তবে কাহার ক্ষতি ? কাহারও নহে। যদি বণিক্ থান বেচিয়া যে লভ্য করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষতি হইল না, তবে তাহারা এ দেশের অর্থ-ভাণ্ডার লুঠ করিল কিসে ? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের অর্থ কমিতেছে কিসে ?

আমরা তাঁতির উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে উদাহরণে একটি দোষ ঘটে। তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইতেছে, তথাপি অনেক তাঁতি অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে না। আমাদের দেশের লোক জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া সহজে অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চাহে না। ইহা তাঁতিদের দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের ধনক্ষতি নাই; কেন না, থানের পরিবর্ত্তে যে চাউল যায়, তদুৎপাদন জন্য যে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি, তাহা হইবেই হইবে। তবে তাঁতি সেই ধন না পাইয়া, অন্য লোকে পাইবে। তাঁতি খাইতে পায় না বলিয়া দেশের ধন কমিতেছে না।

অনেকের এইরূপ বোধ আছে যে, বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া, নগদ টাকা বস্তাবন্দী করিয়া, জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন। এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য,—

প্রথমতঃ, নগদ টাকা লইয়া গেলেই দেশের অর্থহানি হইল না। নগদ টাকাই ধন নহে। যত প্রকার সম্পত্তি আছে, সকলই ধন। নগদ টাকা এক প্রকার ধন মাত্র। তাহার বিনিময়ে আমরা যদি অন্য প্রকার ধন পাই, তবে নগদ টাকা যাওয়ায় নির্ধন হই না।

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বুঝান কঠিন নহে। একজনের এক শত টাকা নগদ আছে, সে সেই এক শত টাকার ধান কিনিয়া গোলাজাত করিল। তাহার আর নগদ টাকা নাই, কিন্তু এক শত টাকার ধান গোলায় আছে। সে কি পূর্ব্বাপেক্ষা গরিব হইল ?

দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবিক বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশ হইতে নগদ টাকা জাহাজে তুলিয়া লইয়া যান না। বাণিজ্যের মূল্য হুণ্ডিতে চলে। সঞ্চিত অর্থ দলিলে থাকে। অতি অল্পমাত্র নগদ টাকা বিলাতে যায়।

তৃতীয়তঃ, যদি নগদ টাকা গেলেই ধনহানি হইত, তাহা হইলে বিদেশীয় বাণিজ্যে আমাদিগের ধনহানি নাই, বরং বৃদ্ধি হইতেছে। কেন না, যে পরিমাণে নগদ টাকা বা রূপা আমাদিগের দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার অনেক গুণ বেশী রূপা অন্য দেশ হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে, এবং সেই রূপায় নগদ টাকা হইতেছে। নগদ টাকাই যদি ধন হইত, তবে আমরা অন্য দেশকে নির্ধন করিয়া নিজের ধন বৃদ্ধি করিতেছি, নিজে নির্ধন হইতেছি না।

এ সকল তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে। যে বিপুল রেলওয়েগুলি প্রস্তুত হইয়াছে, সে অর্থ কাহার?

বিদেশীয় বণিক্‌দিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বলিয়াছি, রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধেও তাহা কিছু কিছু বর্ত্তে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, রাজকর্ম্মচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাইনা। কিন্তু সে সামান্য মাত্র।[১] বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পরিচ্ছেদের পরিচয় মত কৃষি জন্য যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষতি পূরণ হইয়া আরও অনেক ফাজিল থাকিতেছে। অতএব আমাদের ধন বৎসর বৎসর বাড়িতেছে, কমিতেছে না।

৩। লেখক বলিতেছেন, ''যদি মহাত্মা কর্ণ্‌ওয়ালিস্ জমীদারদিগের বর্ত্তমান্ শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েকজন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।''

এ কথাও সকলে বলেন, এ ভ্রমও সাধারণের। আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই যে, জমীদারী বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে—তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাকিত না কেন? যে ধন এখন জমীদারদিগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে থাকিত না ত কোথায় যাইত?

জমীদারের ঘরে ধন আছে, তাহার একমাত্র কারণ যে, তাঁহারা ভূমির উৎপন্ন ভোগ করেন। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত। সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কেবল দুই চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত। সেইটিই এই ভ্রান্ত বিবেচকদিগের আশঙ্কার বিষয়। ধন দুই এক জায়গায় কাঁড়ি বাঁধিলে তাঁহারা

১. এই কথাটাই বড় বেশী ভুল। এ সকল বিচারে ভুল আছে, গোড়ায় স্বীকার করিয়াছি।

ধন আছে বিবেচনা করেন; কাঁড়ি না দেখিতে পাইলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন না। লক্ষ লক্ষ টাকা এক জায়গায় গাদা করিলে অনেক দেখায়; কিন্তু আধ ক্রোশ অন্তর একটি একটি ছড়াইলে টাকা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই লক্ষ টাকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, ধনের কোন্ অবস্থা দেশের পক্ষে ভাল; দুই এক স্থানে কাঁড়ি ভাল, না ঘরে ঘরে ছড়ান ভাল; পূর্ব্বপণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, এক স্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্ব্বরতাজনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়। সমাজতত্ত্ববিদেরাও এ তত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেইরূপই স্থির করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানানুসারে ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহাই ন্যায়সঙ্গত। পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণ্ওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দূষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই চারি জন অতিধনবান্ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। দেশশুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ সাত জন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না—সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিষ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানে অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই। যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন, এ দেশে প্রায় তাঁহার গর্দ্দভজন্ম ঘটিয়া উঠে। আর যাহারা নিতান্ত অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ অধিক বড় মানুষ না হইয়া, জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্যপ্রকৃত হইত। দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশ্যনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন, তৎপরিবর্ত্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জ্জনগম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।

আমরা দেখাইলাম যে, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাঁহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

[১২৭৯ ভাদ্র-কার্ত্তিক-পৌষ-ফাল্গুন। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা

মানুষের এমন দুরবস্থা কখন হইতে পারে না যে, তাহাতে শুভ কিছুই দেখা যায় না। আমাদিগের গুরুতর দুর্ভাগ্যেও কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে অশুভের মধ্যে শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে, সেই বিজ্ঞ। দুঃখও যে কেবল দুঃখ নহে, দুঃখের দিনে এ কথার আলোচনায় কিছু সুখ আছে।

ভারতবর্ষ পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল—এখন অনেক শত বৎসর হইতে পরাধীন। নব্য ভারতবর্ষীয়েরা ইহা ঘোরতর দুঃখ মনে করেন। আমাদিগের ইচ্ছা যে, সেই প্রাচীন স্বাধীনতায় এবং আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলনা করিয়া দেখি। দেখি যে, দুঃখই বা কি, সুখ কি।

কিন্তু স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দ্দেশ। কিন্তু কোন্ বিষয়ের তারতম্য আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়? প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধুনিক ভারত পরাধীন, এ কথা বলিয়া কি উপকার? আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া আবশ্যক যে, প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখী ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী?

এতক্ষণে অনেকে আমাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সুখ, তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি। স্বীকার করি। কিন্তু স্বাধীনতা পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহার সদুত্তর পাওয়া ভার।

বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটি কথা শিখিয়াছেন—"Liberty," "Independence," তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দুইটি কথা পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, দুইটি শব্দে এক পদার্থকে বুঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে তাঁহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এই জন্য মোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে বা সেরাজউদ্দৌলার শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারের সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।

মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ইংরেজকন্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন না। তাঁহারা জর্ম্মান্। তৃতীয় উইলিয়ম ওলন্দাজ ছিলেন। বোনাপার্টি কর্সিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব প্রাচীন বুর্ব্বোবংশীয় রাজারা ফরাশী ছিলেন। রোমসাম্রাজ্যের সিংহাসনে অনেক বর্ব্বরজাতীয় সম্রাট্ আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, এই সকল রাজ্যে তত্তদবস্থায় রাজা ভিন্নজাতীয় ছিলেন। ঐ সকল রাজ্য তৎকালে পরাধীন বা পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বলিবেন না, বলা যাইতে পারে। যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলণ্ডকে বা ত্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল, তবে শাহজাঁহা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবর্দ্দি-শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন?

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্ত্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার শাসনকর্ত্তৃগণ স্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশ মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যায় না।

তবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি?

ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্ত্র রাজ্য বটে। রোমকজিত, ব্রিটেন হইতে সিরিয়া পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসকল পরতন্ত্র ছিল বটে। আলজিয়ার্স বা জামেকা পরতন্ত্র রাজ্য বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্র? এ সকল এক একটি পৃথক্ রাজ্য নহে, ভিন্নদেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মাত্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না—ভারতবর্ষের রাজা ভারতবর্ষে নাই। অন্য দেশে। যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহাসনারূঢ় এবং অন্যদেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র।

দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র, একটি স্বতন্ত্র। যে দেশে রাজা বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি পরতন্ত্র।

এইরূপ পরিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইংলণ্ডের প্রথম জেম্স্, স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড দুই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, স্কটলণ্ড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিলেন। স্কটলণ্ড কি ইংলণ্ডকে রাজা দিয়া পরতন্ত্র হইল? বাবর শাহ, ভারত জয় করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপনপূর্ব্বক, তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত করিতে লাগিলেন—তাঁহার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া, তথায় অধিষ্ঠান করিয়া, পৈতৃক রাজ্য হানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন;— হানোবর কি তখন পরতন্ত্র হইয়াছিল?

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথম জেম্স্ বা প্রথম জর্জ বা প্রথম মোগলের পূর্ব্বরাজ্যের পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্ত্র্য ঘটিয়াছিল

মাত্র। পরাধীনতা ঘটে নাই। আমরা Independence শব্দের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতা, এবং Liberty শব্দের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তত্তদভাব স্থানে তত্তদভাবসূচক শব্দ ব্যবহার করিতেছি।

তবে পারতন্ত্র্য এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার প্রভেদ কি?

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে, আমরা সে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি। কেন না, সে অর্থ এই উপস্থিত বিচারের উপযোগী নহে। যে অর্থ ভারতবর্ষীয়েরা বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব।

ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশের রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে। যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন।

অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে, কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে; যথা, নর্ম্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড, ঔরঞ্জেবের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আক্‌বরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র ও পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্ত্র্য-পারতন্ত্র্যজন্য যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচনা করা যাউক—পশ্চাৎ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা বিবেচনা করা যাইবে। রাজা অন্যদেশবাসী হইলে দুইটি অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা; প্রথম, রাজা দূরে থাকিলে সুশাসনের বিঘ্ন হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রতি তাঁহার অধিক আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন। এই দুইটি দোষ যে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে না, এমত নহে। মহারাণী বিক্টোরিয়ার সিংহাসন দিল্লী বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইত, তাহার সন্দেহ নাই; কেন না, যাহা রাজার নিকটবর্ত্তী, তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ হয়। দ্বিতীয় দোষটিও ঘটিতেছে। ইংলণ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী ভারতবর্ষ। "হোম চার্জেস" বলিয়া যে ব্যয় বজেটভুক্ত হয় তাহার মধ্যে অনেকগুলিই এইরূপ ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার। এইরূপ অনেক আছে।

রাজা দূরস্থিত বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন ঘটে বটে, কিন্তু তেমন রাজা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুশাসনের যে সকল বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা ঘটে না। কোন রাজা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র,—অন্তঃপুরেই বাস করেন, রাজ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। কোন

রাজা নিষ্ঠুর, কোন রাজা অর্থগৃধ্নু। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরস্থিত রাজা বা রাজ্ঞীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, তাহার ফল ভারতবর্ষে ফলিবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মসুখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত। পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করিয়া আত্মসুখ বিধান করিলেন, তাহাতে উভয় মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, উভয়ের অপ্রীতি ও তেজোহানি ঘটিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন উভয়েই মুসলমানের হস্তে পতিত হইলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবাসী রাজার আত্মসুখের অনুরোধে কোন অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এটি কেবল পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতায় প্রভেদ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য, এবং দেশীয় প্রজাসকল তাঁহাদিগের নিকট অবনত, তাঁহাদিগের সুখের জন্য কিয়দংশে যে ভারতবাসীদিগের সুখের লাঘব ঘটিয়া থাকে, তাহা এ দেশীয় কোন লোকই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তত্তুল্য বর্ণপীড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শূদ্র ; উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয় শূদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন। সেই বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেশের শাসনকর্ত্তা। কিন্তু এ সকল কথা একটু সবিস্তারে লেখা আবশ্যক হইল।

লোকের বিশ্বাস আছে যে, প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষত্রিয়ই রাজা ছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে, রাজকার্য্য দুই অংশে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল। রাজব্যবস্থা নির্ব্বাচন, বিচার ইত্যাদি কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। এক্ষণে যেমন সিবিল ও মিলিটরি, এই দুই অংশে রাজকার্য্য বিভক্ত, তখনকার কর্ম্মভাগ কতকটা সেইরূপই ছিল। ব্রাহ্মণেরা সিবিল কর্ম্মচারী, ক্ষত্রিয়েরা মিলিটরি। এখনও যেমন মিলিটরি অপেক্ষা সিবিল কর্ম্মচারীদিগের প্রাধান্য, তখনও সেইরূপ ছিল ; রাজপুরুষদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা নাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদিগের উপরেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্ব্বদা রাজা ছিলেন, এমত নহে। বোধ হয়, আদ্যকালে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য্য প্রভৃতি সঙ্করজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হোয়েন্থ্ সাঙ সিন্ধুপারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়া গিয়াছিলেন। অন্যত্রও ব্রাহ্মণেরা রাজা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। মধ্যকালে অধিকাংশ রাজাই রাজপূত। রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত সঙ্করজাতি মাত্র। ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, ব্রাহ্মণদিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদদ্বেষী বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকার্য্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই—কেন না, তাঁহারাই পণ্ডিত, সুশিক্ষিত,

এবং কার্য্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃতরূপে রাজপুরুষপদে বাচ্য। সুবিজ্ঞ লেখক বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল মাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর ?

রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে, তাহা দুই প্রকারে ঘটে। এক রাজব্যবস্থাজনিত ; আইনে বিধি থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এই রূপ ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার ইচ্ছাজনিত ; রাজপ্রসাদ রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী বলিয়া রাজ্যের কার্য্যে স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইংরেজ-শাসিত ভারতে, এবং ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতে এই দুইটি দোষ কি প্রকার বর্ত্তমান ছিল দেখা যাউক।

১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুসারে, দেশী অপরাধীদের জন্য এক বিচারালয়, বিলাতি অপরাধীর জন্য অন্য বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ দেশী বিচারক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাহ্মণরাজ্যে দেখা যায়! ইংরেজের জন্য পৃথক বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক নহে। যেমন একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্হ, ইংরেজ দেশী লোককে বধ করিলে আইন অনুসারে সেইরূপ বধার্হ। কিন্তু ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য! কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট ?

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্র কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রধানতম বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন—"রামরাজ্যে" তিনি কোথা থাকিতেন ?

২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজরই প্রাপ্য, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে দেশীয়েরাও উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রদিগের ততটা ঘটিত কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন শূদ্র, কখন কখন রাজসিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য উচ্চ পদও যে শূদ্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচারকার্য্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে,—প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচারকার্য্য শূদ্রের দ্বারা হইত ? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই জানি যে, এ কথা স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচাবকার্য্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ

কি বিচার, কি সৈনাপত্য, কি অন্যান্য প্রধান পদ সকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে বোধ হয়।

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পনা সুকল্পনা নহে; কেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি—ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন, উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। আমাদিগের এইমাত্র বলিবার উদ্দেশ্য যে, আধুনিক ভারতের জাতিপ্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান।

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্য্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধিসঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণবৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্য্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে—আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালনবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এ দিকে উন্নতিরোধক। তেমন আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতায় যেমন এক দিকে ক্ষতি, তেমন আর এক দিকে উন্নতি হইতেছে।

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুই তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি, অনেকের বুঝিবার সুবিধা হইবে।

১। ভিন্নজাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না।

ভিন্নজাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে।

২। স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতা, ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি।

বিদেশনিবাসী রাজশাসিত রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন।

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, যে রাজ্যে লোক দুঃখী, তাহাই অপকৃষ্ট। স্বাতন্ত্র্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রজা কি পরিমাণে দুঃখী, তাহাই বিবেচ্য।

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য। ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ত্ব। প্রথম, রাজা বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনকর্ত্তৃগণ এ দেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না? স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্তৎকারণে সুশাসনের বিঘ্ন ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে।

কিন্তু রাজার চরিত্রদোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না।

৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণপীড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় ব্রাহ্মণপীড়িত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই। তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একটু সুখ ছিল।

৬। আধুনিক ভারতে কার্য্যগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চ্চার অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।

[১২৮০ ভাদ্র। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

একা

"কে গায় ওই?"

বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ-শরীরা নীল-সলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্বুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে, যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার

এখনও তাই আছে, মনুষ্য চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ, মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি, উভয়েই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শীকর সিক্ত, বসন্তপবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহৃত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের

ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সঙ্গীত, তেমনি সংসারের এক সঙ্গীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনিসংমিলিত বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারসঙ্গীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সঙ্গীত। অনন্ত কাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

[১২৮০ ভাদ্র। *'কমলাকান্তের দপ্তর'*]

বিদ্যাপতি ও জয়দেব

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি—জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্যপ্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি ''কবিওয়ালা''র প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্ম্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেইসকল কারণেই ঘটে। কোনকোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বক্‌ল্‌ ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতপ্রিয় বক্‌লের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ

কিছু অল্প। মনুষ্যচরিত্র হইতে ধর্ম্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন, এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মোক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু তাহার গোটাকত স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্য্যগণ অনার্য্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত; তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্য্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনার্য্য শত্রুসকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত; ভারতবর্ষ আর্য্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আর্য্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্ত রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহু কালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আর্য্যকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল। প্রতি নদীকূলে অনন্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র, এ অবস্থা কাব্যে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্ম্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্যরসগ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্ম্মানুকারী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচারশক্তি ধর্ম্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্ম্মই তৃষ্ণা, ধর্ম্মই আলোচনা, ধর্ম্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্ম্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন এক দিকে ধর্ম্মের স্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসাদির কাব্য নাটকাদি।

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্ন এবং উর্ব্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্য্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্ত্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার

পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতিপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানবহৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর এক দল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্যচরিত্র-খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া যাউক। জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে, কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বৌষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাক্‌চিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি, উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ, কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির দল মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ, বিদ্যাপতির গীত, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্লকমলজাল শোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির

কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি ; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ্নসমীরণের নিশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্নশ্রেণীর গীতিকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি, যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ত্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্যলেখকগণকে একটি তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরাজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব্বকবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্ত্তী যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্রসকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধপ্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ় ; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth.

[১২৮০ পৌষ। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

বাঙ্গালির বাহুবল

বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালি সর্ব্বদা উন্নতির জন্য ব্যস্ত। অনেকে তদ্বিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা পোষণ করেন না। কেন না, বাঙ্গালির বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস।

বাঙ্গালির বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা। কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংসা প্রবন্ধান্তরে করা গিয়াছে। থাক্ বা না থাক্, ইহা জানা আছে যে, মৌর্য্যবংশীয় ও গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা হিমাচল হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছিলেন; জানা আছে, দিগ্বিজয়ী গ্রীকজাতি শতদ্রু অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা আছে, সেই বীরেরা আসিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন; জানা আছে যে, তাঁহারা চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা ভারতভূমি হইতে উন্মূলিত হইয়াছিলেন; জানা আছে, হর্ষবর্দ্ধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহু শত করপ্রদ রাজা অনুসরণ করিতেন; জানা আছে, দিগ্বিজয়ী আরবেরা তিন শত বৎসরে পশ্চিমভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারেন নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে। পশ্চিমভারতবর্ষীয়দিগের বীর্য্যবত্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভূমে আছে।

বাঙ্গালির পূর্ব্ববীরত্ব, পূর্ব্বগৌরবের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানি যে, যখন পশ্চিমভারতে বেদ সৃষ্ট ও অধীত হইতেছিল, উপনিষদ্ সকল প্রণীত হইতেছিল, অযোধ্যার ন্যায় সর্ব্বসম্পদ্শালিনী নগরীসকল স্থাপিতা এবং অলঙ্কৃতা হইতেছিল—বাঙ্গালা তখন অনার্য্যভূমি, আর্য্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত[1]। কেবল ইহাই জানি যে, যখন উত্তরভারতে সমস্ত আর্য্যবীরগণ একত্রিত হইয়া কুরুক্ষেত্রজিত রাজ্যখণ্ডসকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি অমর অক্ষয় ধর্ম্মশাস্ত্রসকল প্রণীত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌণ্ড্র প্রভৃতি অনার্য্যজাতির বাস। প্রাচীন কাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ বঙ্গদেশ পর্য্যটনে আসেন, তখন দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ গৌরবশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বঙ্গদেশের পূর্ব্বগৌরব কোথায়?

তবে, ইহার পরে শুনা যায় যে, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড়নগরী বড় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমন

---

১. বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" দেখ।

কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না যে, তাঁহারা এই বাহুবলশূন্য বাঙ্গালিজাতি এবং তাঁহাদিগের প্রতিবাসী তদ্রূপ দুর্ব্বল অনার্য্যজাতিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে যে, মুঙ্গের পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। অন্যত্র তাঁহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমূলক।

প্রথম। কিম্বদন্তী আছে যে, দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল। এ কথা এক খানি দেশী গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত অমূলক, এবং জেনেরল কনিঙহাম সাহেব তাহার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লালসেনের অধিকার দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত যে, অবশ্য একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যাইত। বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বহুবিস্তৃত প্রদেশ, তথায় বঙ্গপ্রভুত্বের কোন কিম্বদন্তী, কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্য থাকিত। কিছু নাই।

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ সালে গৌড়েশ্বর মহীপালরাজের একখানি শাসন কাশীতে পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশীপ্রদেশ মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল। এক্ষণে সে মত পরিত্যক্ত হইতেছে[১]।

তৃতীয়। লক্ষ্মণসেনের দুই একখানি তাম্রশাসনে তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদেশজেতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই বুঝা যায় যে, সে সকল কথা চাটুকার কবির কল্পনা মাত্র।

অতএব পূর্ব্বকালে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুবলের কোন প্রমাণ নাই। হোয়েন্থ্ সাঙ সমতট-রাজ্যবাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে বাঙ্গালিরা এইরূপ খর্ব্বাকৃত, দুর্ব্বল-গঠন ছিল।

বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে কি?

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে, যেরূপ যে অবস্থায় হইয়াছে, সেই অবস্থায় সেইরূপ আবার হইবে। যে যে কারণে বাঙ্গালি চিরকাল দুর্ব্বল, সেই সেই কারণ যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালিরা বাহুবলশূন্য থাকিবে। সে সকল কারণ কি?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহ্য প্রাকৃতিক ফল। বাঙ্গালির দুর্ব্বলতাও বাহ্য প্রকৃতির ফল। ভূমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিতেছি।

---

২. See Introduction to Sherring's Sacred City of the Hindus, by F. E. Hall, p. xxxv. Note 2.

কেহ কেহ বলেন, এ দেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা—অল্প পরিশ্রমেই শস্যোৎপাদন হইতে পারে। সুতরাং বাঙ্গালিকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পরিশ্রম অধিক না করিলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা বঙ্গবাসীর দুর্ব্বলতার কারণ।

তাঁহারা আরও বলেন যে, ভূমি উর্ব্বরা হইলে আহারের জন্য মৃগয়া পশুহননাদির আবশ্যকাদি হয় না। পশুহনন ব্যবসায়, বল, সাহস ও পরিশ্রমের কার্য্য, মনুষ্যকে সর্ব্বদা পরিশ্রমে নিরত রাখে, এবং তাহাতে ঐ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্ব্বর দেশ আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্ব্বরতায় ন্যূন নহে। সে সকল দেশের লোক দুর্ব্বল নহে।

অনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল। যে দেশের বায়ু আর্দ্র অথচ তাপযুক্ত, সে দেশের লোক দুর্ব্বল। কেন হয়, তাহা শারীরতত্ত্ববিদেরা ভাল করিয়া বুঝান নাই। বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত টীকা পাঠ করিলেই সংশয় দূর হইতে পারে[১]। আর যাঁহারা আরব প্রভৃতি জাতির বীর্য্য জানেন, তাঁহারা তাপকে দৌর্ব্বল্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

অনেকে মোটামুটি বলেন যে, জলসিক্ত তাপযুক্ত বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তন্নিবন্ধন বাঙ্গালিরা নিত্য রুগ্ন, এবং তাহাই বাঙ্গালির দুর্ব্বলতার কারণ।

অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল। এ দেশের ভূমির প্রধান উৎপাদ্য চাউল, এবং এ দেশের লোকের খাদ্য ভাত। ভাত অতি অসার খাদ্য, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর গঠে না। এ জন্য "ভেতো বাঙ্গালি" বলিয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক হইয়াছে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে ষ্টার্চ্চ, গ্লুটেন প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্লুটেন নাইট্রজেন-প্রধান সামগ্রী। তাহাতেই শরীরের পুষ্টি। মাংসপেশী প্রভৃতির পুষ্টির জন্য এই সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন। ভাতে ইহা অতি অল্প পরিমাণে থাকে। মাংসে বা গমে ইহা অধিক

১. The high humidity of the atmosphere in Bengal, and more especially in its eastern districts, has become proverbial : and if the term be used in reference to the quantity of vapour in the air as measured by its tension, the popular belief is justified by observations. But if used in the more usual sense of relative humidity, that is, as referring to the percentage of vapour in the air in proportion to that which would saturate it, the average annual humidity of a large part of Bengal is sensibly lower than that of England.

The quantity of vapour in the air of Calcutta, relative to the dry air, is on the average of the year, about twice as great as in that of London ; but the relative humidity of the former equals that of the latter only in the three first months of the rains, which are among the driest months of an European climate.—Bengal Adiministration Report, 1872-73, Statistical Summary.— Page 5-6.

পরিমাণে থাকে। এই জন্য মাংসভোজী এবং গোধূমভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান্—"ভেতো" জাতির শরীর দুর্ব্বল। ময়দায় গ্লুটেন শতভাগে দশভাগ থাকে[১]; মাংসে (Fibrin বা Musculine) ১৯ ভাগ[২]; এবং ভাতে ৭ কি ৮ ভাগ মাত্র থাকে[৩]। সুতরাং বাঙ্গালি দুর্ব্বল হইবে বৈ কি।

কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরমশত্রু—বাল্যবিবাহের কারণেই বাঙ্গালির শরীর দুর্ব্বল। যে সন্তানের মাতা পিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহাদের শরীর ও বল চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইন্দ্রিসুখে নিরত, তাহারা বলবান্ হইবার সম্ভাবনা কি?

বাঙ্গালি মনুষ্যেরই কি, বাঙ্গালি পশুরই কি, দুর্ব্বলতা যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু জলের বা বায়ুর বা মৃত্তিকার কোন্ দোষের এই কুফল, তাহা কোন পণ্ডিতে অবধারিত করেন নাই।

কিন্তু এই দুর্ব্বলতার যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে এমত ভরসা করা যায় না যে, অল্পকালে সে দর্ব্বলতা দূর হইবে। তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে, কোন কালে এ সকল কারণ অপনীত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহই যদি এ দুর্ব্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে; এবং বাঙ্গালির শরীরে বলসঞ্চার হইবে। যদি চাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, গোধূমাদির চাষ এ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ হইবে। এমন কি, কালে জলবায়ুও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এক্ষণে মনুষ্যবাসের অযোগ্য যে সুন্দরবন, তাহা এককালে বহুজনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী প্রভৃতি উষ্ণদেশবাসী জীবের আবাস ছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথা—সহস্র সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক কালের মধ্যেও জলবায়ু শীততাপের পরিবর্ত্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে রোমনগরীর নিম্নে টৈবর নদের মধ্যে বরফ জমিয়া যাইত। এবং এক সময়ে ক্রমাগত চল্লিশ দিন তাহাতে বরফ জমিয়া ছিল। কৃষ্ণসাগরে (Euxine Sea) অবিদ নামক কবির জীবনকালে প্রতি বৎসর শীত ঋতুতে বরফ জমিয়া যাইত। এবং রীণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত যে, তাহার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ি চলিত। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণসাগরে বা উক্ত নদীদ্বয়ে বরফের নামমাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্য্যের আধিক্যে, বন কাটায়, মৃত্তিকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল বিল শুষ্ক

১. Johnstone's *Chemistry of Common Life,* Vol. I, p.100.

২. Ibid, p. 125.

৩. Ibid, p. 101.

করায় এ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি কৃষিকার্য্যের আধিক্যে শীতপ্রদেশ উষ্ণ হয়, তবে উষ্ণপ্রদেশ শীতল হইবার কারণ কি? গ্রীনলণ্ড এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল যে, ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম গ্রীনলণ্ড হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গ্রীনলণ্ড সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র হিমশিলায় মণ্ডিত! এই দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে বহুসংখ্যক ঐশ্বর্য্যশালী উপনিবেশ ছিল,—এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল উপনিবেশের চিহ্নমাত্র নাই। লাব্রাডর এক্ষণে শৈত্যাধিক্যের জন্য বিখ্যাত—কিন্তু যখন সহস্র খ্রীষ্টাব্দে নর্ম্মানেরা তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অল্পতা দেখিয়া তাঁহারা প্রীত হইয়াছিলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাক্ষাভূমি নাম দিয়াছেন।[১]

এ সকল পরিবর্ত্তনের অতি দূর সম্ভাবনা। না ঘটিবারই সম্ভাবনা। বাঙ্গালির শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ; কেন না, দুর্ব্বলতার নিবার্য্য কারণ দেখা যায় না।

তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের দুইটি উত্তর আছে।

প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ; মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন, এ জন্য শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র। এ জগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই?

বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে কাহারও উন্নতি হয় না। যে তাতার ইউরোপ আসিয়া জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ঘটে।

দ্বিতীয় উত্তরে আমরা যাহা বলিতেছি, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, সর্ব্ব নগরে, সর্ব্ব গ্রামে সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে দুর্ব্বল—তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই—তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে, শারীরিক বল বাহুবল নহে।

মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তি অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্ব্বত্য বন্য জাতি হিমালয়ের পশ্চিম ভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান্ কে? এক এক জন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর গোরাকে ঘূর্ণ্যমান হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া ভারত অধিকার করিল—কাবুলির সঙ্গে ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের

১. *The Scientific American.*

সম্বন্ধ রহিল কেন? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শীক ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে।

উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এ জন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই।

কিন্তু সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালিচরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।

বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপূর্ণবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষের অপূর্ত্তিজন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি, যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ না হয়। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে উদ্যম জন্মিবে। ঐতিহাসিক কালমধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই।

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্য আলস্যসুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।

যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে।

অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।

বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।

[১২৮১ শ্রাবণ। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

ভালবাসার অত্যাচার

লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শত্রু, অথবা স্নেহ-দয়া-দাক্ষিণ্যশূন্য ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে, সেই অত্যাচার করে। ভালবাসিলেই অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে, আমার কথা শুনিতে হইবে; আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে। তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে ভালবাসে, সে যে কার্য্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন্ কার্য্য মঙ্গলজনক, কোন্ কার্য্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন; অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় যিনি কার্য্যকর্ত্তা, এবং তাহার ফলভোগী, তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তিনি আত্মমতানুসারেই কার্য্য করেন; এবং তাঁহার মতের বিপরীত কার্য্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী নহেন। রাজাই কেবল অধিকারী, এই জন্য যে, তিনি সমাজের হিতাহিতবেত্তাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কেবল তাঁহারই সদসৎ বিবেচনা অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি; যে অধিকার তাঁহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কার্য্য করাতে কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তাঁহারও অধিকার নাই; যে কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, তৎপ্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাঁহার অধিকার; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন।[১] যাহাতে কেবল আমার নিজের অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেই অধিকারী; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্বিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন। সমাজস্থ

১. যদি রাজার এমন অধিকার আছে, স্বীকার করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, যে আপনার চিকিৎসা করিবে না বা যে অল্প বয়সে বা বুড়া বয়সে বিবাহ করিবে, রাজা তাহার দণ্ড করিতে অধিকারী। আর রাজার যদি এরূপ অধিকার স্বীকার করা না যায়, তবে চড়ক বন্ধ, সতীদাহ বন্ধ প্রভৃতি আইনের সমর্থন করা যায় না।

সকলেরই অধিকার আছে যে, সকল কার্য্যই, পরের অনিষ্ট না করিয়া আপনাপন প্রবৃত্তিমত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা স্বেচ্ছাচারিতা; পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্ত্তিতা। যে এই স্বানুবর্ত্তিতার বিঘ্ন করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনুসারে কার্য্য করায়, সেই অত্যাচারী। রাজা ও সমাজ ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন।

রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্ব্ব পণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যত্ন ও বিচারদক্ষতা, তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় না। কবিগণ সর্ব্বতত্ত্বদর্শী এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথকৃত রামেয় নির্ব্বাসনে, দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভ্রাতৃগণের নির্ব্বাসনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতিপাদিতা করিয়াছেন। কিন্তু কবিরা নীতিবেত্তা নহেন; নীতিবেত্তারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ তত্ত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেন না, এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সুহৃৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া, তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বাসনা করিয়াছ, এমন সময়ে তোমার পিতা আসিয়া বলিলেন, অমুক বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভূত হইয়া, সেই কালকূটরূপিণী ধনিকন্যা বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্র্যপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া, দারিদ্র্য মোচনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিদ্র্যে সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের উপার্জ্জিত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটি নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং হিন্দুসমাজে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। ভার্য্যার ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ নববঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যক কি? আর স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্ম্মতঃ একটু বলা কর্ত্তব্য যে, কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু অনেকগুলিই বাহুবলের অত্যাচার।

যাহা হউক, মনুষ্যজীবন ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনুষ্য অত্যাচারপীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার; অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যেই

বলিষ্ঠ, সেই পরপীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায় ধর্ম্মের অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায় সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার। এই চতুর্ব্বিধ পীড়নের মধ্যে, প্রণয়ের পীড়ন কাহারও পীড়ন অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা ধর্ম্মবেত্তা, কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্ নহেন বা কেহ তেমন সদা সর্ব্বক্ষণ সকল কাজে আসিয়াই হস্তক্ষেপণ করেন না—সুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী, ইহা বলা যাইতে পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেন না, অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা, প্রজাপীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে; কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু ধর্ম্মের পীড়নে এবং স্নেহের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই—কেন না, ইহাদিগের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজি পাঁটার বাটি দেখিলে কখন কখন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংসভোজনের ঔচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না—কেন না, জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজি পরলোকে গোলক প্রাপ্ত হইবেন।

মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মনুষ্যের প্রয়োজনে। জড়পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে মনুষ্যজীবন নির্ব্বাহ হয় না, এ জন্য বাহুবলের প্রয়োজন। এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বৃদ্ধি করিবার জন্য সমাজের প্রয়োজন; এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে সমাজবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরস্পরে আন্তরিক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের সুনির্ব্বাহ হয় না। অতএব সমাজের যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রূপ বা ততোধিক প্রয়োজন। এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুষ্যের ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না। অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদৃত না করিয়া, মনুষ্য ধর্ম্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরূপ ধর্ম্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মেরও অত্যাচার আছে বটে, এবং ধর্ম্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্তা হয়, তাহারও অত্যাচার ঘটিবে; কেন না, অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। যদি ধর্ম্মের অত্যাচার শমতায় সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়সাগরে অনল্প ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্যকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না।

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সম্ভব। এ কথা যথার্থ, স্বীকার করি। স্নেহ যদি স্বার্থপরতাশূন্য হয়, তবে তাহা ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এইরূপ যে, স্বার্থপরতাশূন্য স্নেহ দুর্লভ। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা স্নেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না—সে কি স্বার্থপর? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না; কেন না, পুত্র অর্থোপার্জ্জন করিলে কোন্ না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন?—অতএব ঐরূপ দর্শনমাত্র আকাঙ্ক্ষী স্নেহকে অনেকেই অস্বার্থপর স্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে—এ স্নেহ অস্বার্থপর নহে। যাঁহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাঁহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা মনে করেন; যে ধনের কামনা করে না, তাহাকে স্বার্থপরতাশূন্য মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পুত্রমুখদর্শনসুখের বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র্যে সমর্পণ করিল, সেও আত্মসুখ খুঁজিল। সে অর্থজনিত সুখ চায় না, কিন্তু পুত্রসন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে; মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের যদি সুখ থাকে, থাক্;—সে স্বতন্ত্র, পুত্রের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খুঁজিল—নিত্য পুত্রমুখদর্শন; তাহার অভিলাষিণী হইয়া পুত্রকে দারিদ্র্যদুঃখে দুঃখী করিতে চাহিল; এখানে মাতা স্বার্থপর; কেন না, আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল।

মনুষ্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্তসুখকর, কিন্তু স্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল, প্রণয়ী অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয়সুখের অভিলাষী, এই জন্য লোকে এইরূপ স্নেহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, সে স্নেহযুক্তের; স্নেহযুক্ত আপন সুখের আকাঙ্ক্ষী বলিয়া, সাধারণ মনুষ্যস্নেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতে হইবে।

কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য স্নেহ মনুষ্যহৃদয়ে স্থাপিত নহে। মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর। মনুষ্যের চরিত্র এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উৎকর্ষ লাভ করে নাই বলিয়াই মনুষ্যস্নেহ অদ্যাপি পশুবৎ। পশুবৎ, কেন না, পশুদিগেরও বৎসস্নেহ, দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাৎসল্য, দাম্পত্য ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে।

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা। যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায়, পুত্রমুখ দর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই যথার্থ স্নেহবতী। যে প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী।

যত দিন না সাধারণ মনুষ্যের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, তত দিন মানুষের ভালবাসা হইতে স্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্নেহের যথার্থ স্ফূর্ত্তি

ঘটিবে না। যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারায় ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। এরূপ বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য দুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না—তাঁহারা অত্যাচারীও নহেন। অন্যত্র, ধর্ম্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম্ম এক। দুইটি মাত্র মূলসূত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয়। যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে,—এবং আত্মচিত্তের স্ফূর্ত্তি এবং নির্ম্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি, পরসম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ ধর্ম্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। "পরের অনিষ্ট করিও না; সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও।" এই মহতী উক্তি জগতীয় তাবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রের একমাত্র মূল, এবং একমাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্ত্বের সহিত, এই মহানীতিতত্ত্বের ঐক্য আছে। এবং পরহিতনীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ।

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূল সূত্রাবলম্বন করিলেই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইবে। যখন স্নেহশালী ব্যক্তি স্নেহের পাত্রের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন তাঁহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত যে, আমি কেবল আপন সুখের জন্য হস্তক্ষেপ করিব না; আপনার ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব; তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না।

এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র, এবং পুরাতন জনশ্রুতির পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ, দশরথকৃত রামনির্ব্বাসন মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব; তদ্দ্বারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এ স্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত; কৈকেয়ী দশরথের উপরে; দশরথ রামের উপরে। ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তৎপ্রতি যতটা কটূক্তি হইয়া আসিতেছে, ততটা বিহিত কি না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইষ্ট কামনা করে নাই; আপনার পুত্রের শুভ কামনা করিয়াছিল। সত্য বটে, পুত্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা মাতা স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কার্য্য তদপেক্ষা যে শতগুণে অস্বার্থপর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ সত্যপালনার্থ রামকে বনপ্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণ বিয়োগ এবং প্রাণাধিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যেতিহাস তাঁহার যশঃ কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত করিয়া, সত্যপালন করায়, ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসা করি, সত্যমাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র পুরুষের কাছে ধর্ম্মত্যাগে প্রতিশ্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যদি কেহ দস্যুর প্ররোচনায় সুহৃদ্‌কে বিনাদোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয়?

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়; কেন না, সত্য নিত্যধর্ম্ম, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদি পাপ পুণ্যের এমন নিয়ম কর যে, যখন যাহা কর্ম্মকর্ত্তার বিবেচনায় ইষ্টকারক, তাহাই কর্ত্তব্য; যাহা তাঁহার তাৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্টকারক, তাহা অকর্ত্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না—লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না—কেন না, হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। স্থূল কথার উত্তর দিব।

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্ম্মনীতির যে মূল সূত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর।

সত্য কি সর্ব্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্য, সত্য পালনীয় কেন? সত্য পালনের একটি মূল ধর্ম্মনীতিতে, একটি মূল আত্ম-সংস্কারনীতিতে। আমরা আত্ম-সংস্কারনীতিকে ধর্ম্মনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি; ধর্ম্মনীতির মূলই দেখিব। বিশেষ, উভয়ের ফল একই। ধর্ম্মনীতির মূল সূত্র, পরের অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহা অকর্ত্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এ জন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্য ভঙ্গে তত দূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট; সত্য ভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন।

এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশূন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন; অতএব

যশোরক্ষারূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি স্বার্থপর। স্বার্থপরতা-দোষযুক্ত যে অনিষ্ট, তাহা ঘোরতর পাপ।

অস্বার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য, অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম, এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ। সর্ব্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম্ম যতদিন না সার্ব্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, তত দিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্যগণ, কার্য্যতঃ স্নেহকে ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে, এ জন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্ম্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক।

[১২৮১ অগ্রহায়ণ। '*বিবিধ প্রবন্ধ*']

বিড়াল

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্ হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

চাহিয়া দেখিলাম— হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জ্জারসুন্দরী, নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও!" শব্দের একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, "তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?"

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত ; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, ‘‘মেও!’’ প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মার্জ্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, ‘‘মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

‘‘দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

‘‘দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয় ; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

‘‘দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দ্দামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জ্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্য্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, 'মেও! মেও! খাইতে পাই না!—' আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী; কেন না, আফিংখোর; তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জ্জারপণ্ডিতে! তোমার কথা গুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক্! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, ‘‘সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।’’ বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, ‘‘আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব ?’’

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, ‘‘সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অবএব চোরের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।’’

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, ‘‘চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।’’

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, ‘‘এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষনে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।’’

মার্জ্জার বলিল, ‘‘আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।’’

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

[১২৮১ চৈত্র। *‘কমলাকান্তের দপ্তরে’*]

চন্দ্রলোক

এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়,—বিচ্ছেদে, মিলনে,—অলঙ্কারে, খোশামোদে,—তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকরলেখা শশী মসি ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি ছড়াছড়ি, কখন তাঁহাদিগের নখরে গড়াগড়ি গিয়াছেন; সুধাকর, হিমকরকরনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে, বাঙ্গালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্য-কুঞ্জে লীলা খেলা করিয়া, কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই। আর সাধের সাহিত্য-বৃন্দাবনে লীলা খেলা চলে না—কুঞ্জদ্বারে, সাহেব অক্রূর রথ আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; চল, চন্দ্র, বিজ্ঞান-মথুরায় চল; একটা কংস বধ করিতে হইবে।

যখন অভিমন্যু-শোকে ভদ্রার্জ্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন-সমুদ্রে এই সুবর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও মনে করি, বুঝি এই সুবর্ণময় লোকে সোনার মানুষ সোনার থালে সোনার মাছ ভাজিয়া সোনার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং অপূর্ব্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে—এ পোড়া লোকে যেন কেহ যায় না—এ দগ্ধ মরুভূমি মাত্র। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে, সৌরজগতের সঙ্গে চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে—উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের বশবর্ত্তী—কিন্তু পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশী গুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক যে, সেই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ বোধ হয়। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন যে, চন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতর পৃথিবী; ইহার ব্যাস ১০৫০ ক্রোশ; অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী। যে সকল কবিগণ নায়িকাদিগকে আর প্রাচীন প্রথামত চন্দ্রমুখী বলিয়া সন্তুষ্ট নহেন—নূতন উপমার অনুসন্ধান করেন—তাঁহাদিগকে আমরা পরামর্শ

দিই যে, এক্ষণ অবধি নায়িকাগণকে পৃথিবীমুখী বলিতে আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে অলঙ্কারের কিছু গৌরব হইবে। বুঝাইবে যে, সুন্দরীর মুখমণ্ডলের ব্যাস কেবল সহস্র ক্রোশ নহে—কিছু কম চারি সহস্র ক্রোশ।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ মাত্র—ত্রিশ হাজার যোজন মাত্র। গাগনিক গণনায় এ দূরতা অতি সামান্য—এপাড়া ওপাড়া। ত্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে। চন্দ্র পর্য্যন্ত রেলওয়ে যদি থাকিত, তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল গেলে, দিন রাত্র চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌঁছান যায়।

সুতরাং আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্গণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্ত্তী মনে করেন। তাঁহাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা চন্দ্রাদিকে ২৪০০ গুণ বৃহত্তর দেখা যায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, চন্দ্র যদি আমাদিগের নেত্র হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, এক্ষণেও ঐ সকল দূরবীক্ষণ সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পারি।

এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে, তিনি হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেবতা নহেন, জ্যোতির্ম্ময় কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষাণময়, আগ্নেয় গিরিপরিপূর্ণ, জড়পিণ্ড। কোথাও অত্যুন্নত পর্ব্বতমালা—কোথাও গভীর গহ্বররাজি। চন্দ্র যে উজ্জ্বল, তাহা সূর্য্যালোকের কারণে। আমরা পৃথিবীতেও দেখি যে, যাহা রৌদ্রপ্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রও রৌদ্রপ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল। কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না লাগে, সে স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে যে, চন্দ্রের কলায় কলায় হ্রাস বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। সে তত্ত্ব বুঝাইয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে, যে স্থান উন্নত, সেই স্থানে রৌদ্র লাগে—সেই স্থান আমরা উজ্জ্বল দেখি—যে স্থানে গহ্বর অথবা পর্ব্বতের ছায়া, সে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না—সে স্থলগুলি আমরা কালিমাপূর্ণ দেখি। সেই অনুজ্জ্বল রৌদ্রশূন্য স্থানগুলিই "কলঙ্ক"—অথবা "মৃগ"—প্রাচীনাদিগের মতে সেইগুলিই "কদম-তলায় বুড়ী চরকা কাটিতেছে।"

চন্দ্রের বহির্ভাগের এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে, তাহায় চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার পর্ব্বতাবলী ও প্রদেশসকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং তাহার পর্ব্বতমালার উচ্চতা পরিমিত হইয়াছে। বেয়র ও মাল্লর নামক সুপরিচিত জ্যোতির্ব্বিদ্দ্বয় অন্যূন ১০৯৫টি চান্দ্র পর্ব্বতের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মনুষ্যে যে পর্ব্বতের নাম রাখিয়াছে "নিউটন", তাহার উচ্চতা ২২,৮২৩ ফিট। এতাদৃশ উচ্চ পর্ব্বত-শিখর, পৃথিবীতে আন্দিস্ ও হিমালয়শ্রেণী ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশৎ ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায়, চান্দ্র পর্ব্বতসকল অত্যন্ত উচ্চ। চন্দ্রের

তুলনায় নিউটন যেমন উচ্চ, চিম্বারোজা নামক বৃহৎ পার্থিব শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশৎ গুণে বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর তুলনায় তত উচ্চ হইত।

চান্দ্র পর্ব্বত কেবল যে আশ্চর্য্য উচ্চ এমত নহে; চন্দ্রলোকে আগ্নেয় পর্ব্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত আগ্নেয় পর্ব্বতশ্রেণী অগ্ন্যুদ্গারী বিশাল রন্ধ্রসকল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে—যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বাল প্রাপ্ত হইয়া কোন কালে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্রধা বিভিন্ন, সহস্র সহস্র বিবরবিশিষ্ট—কেবল পাষাণ, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ, পাষাণময়। হায়! এমন চাঁদের সঙ্গে কে সুন্দরীদিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল?

এই ত পোড়া চন্দ্রলোক! এক্ষণে জিজ্ঞাসা, এখানে জীবের বসতি আছে কি? আমরা যত দূর জানি, জল বায়ু ভিন্ন জীবের বসতি নাই; যেখানে জল বা বায়ু নাই, সেখানে আমাদের জ্ঞানগোচরে জীব থাকিতে পারে না। যদি চন্দ্রলোকে জল বায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে পারে; যদি জল বায়ু না থাকে, তবে জীব নাই, এক প্রকার সিদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে দেখা যাউক, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে।

মনে কর, চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, কোন নক্ষত্র, চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গতি করিবে। ইহাকে জ্যোতিষে সমাবরণ (Occultation) বলা যাইতে পারে। নক্ষত্র চন্দ্র কর্ত্তৃক সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে, বায়ুস্তরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে; তৎপরে চন্দ্রশরীরের পশ্চাতে লুকাইবে। যখন বায়বীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে, তখন নক্ষত্র পূর্ব্বমত উজ্জ্বল বোধ হইবে না; কেন না, বায়ু আলোকের কিয়ৎপরিমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে। নিকটস্থ বস্তু আমরা যত স্পষ্ট দেখি, দূরস্থ বস্তু আমরা তত স্পষ্ট দেখিতে পাই না—তাহার কারণ, মধ্যবর্ত্তী বায়ুস্তর। অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র ক্রমে হ্রস্বতেজা হইয়া পরে চন্দ্রান্তরালে অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এরূপ ঘটিয়া থাকে না। সমাবরণীয় নক্ষত্র একেবারেই নিবিয়া যায়—নিবিবার পূর্ব্বে তাহার উজ্জ্বলতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। চন্দ্রে বায়ু থাকিলে কখন এরূপ হইত না।

চন্দ্রে যে জল নাই, তাহারও প্রমাণ আছে, কিন্তু সে প্রমাণ অতি দুরূহ—সাধারণ পাঠককে অল্পে বুঝান যাইবে না। এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণ-রেখা পরীক্ষক (Spectroscope) যন্ত্রের বিচিত্র পরীক্ষায় দূরীকৃত হইয়াছে; চন্দ্রলোকে জলও নাই, বায়ুও নাই। যদি জল বায়ু না থাকে, তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব তথায় নাই।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা উপসংহার করিব। চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সম্বর্ত্তন করে, অতএব আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখ যে, পৌষ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা এত তাপাধিক্য ভোগ করি, তাহার কারণ—পৌষ

মাসে দিন ছোট, জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন তিন চারি ঘণ্টা বড়। যদি দিনমান তিন চারি ঘণ্টা মাত্র বড় হইলেই, এত তাপাধিক্য হয়, তবে পাক্ষিক চান্দ্র দিবসে না জানি, চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। তাতে আবার পৃথিবীতে জল, বায়ু, মেঘ আছে—তজ্জন্য পার্থিব সন্তাপ বিশেষ প্রকারে শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জল বায়ু মেঘ ইত্যাদি চন্দ্রে কিছুই নাই। তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়। অতি সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। বিখ্যাত দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণকারীর পুত্র লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পরিমিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ, তত্তুলনায় যে জল অগ্নিসংস্পর্শে ফুটিতেছে, তাহাও শীতল। সে সন্তাপে কোন পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না—মুহূর্ত্ত জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না। এই কি শীতরশ্মি, হিমকর, সুধাংশু ? হায়! হায়! অন্ধ পুত্রকে পদ্মলোচন আর কেমন করিয়া বলিতে হয় ? [১]

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক পাষাণময়,—বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্ন-ভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ, পাষাণময়! জলশূন্য, সাগরশূন্য, নদীশূন্য, তড়াগশূন্য, বায়ুশূন্য, মেঘশূন্য, বৃষ্টিশূন্য—জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, [২] উত্তপ্ত, জ্বলন্ত, নরককুণ্ডতুল্য এই চন্দ্রলোক!

এই জন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কাব্য গড়ে—বিজ্ঞান ভাঙ্গে।

[১২৮১ চৈত্র। *'বিজ্ঞানরহস্য'*]

---

১. যদি কেহ বলেন যে, চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাঁহার আলোকের শৈত্য স্পর্শের প্রত্যক্ষ দ্বারা জানিয়া থাকি। বাস্তবিক এ কথা সত্য নহে—আমরা স্পর্শ দ্বারা চন্দ্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা কিছুই অনুভূত করি না। অন্ধকার-রাত্রের অপেক্ষা জ্যোৎস্না রাত্রি শীতল, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, তবে সে তাঁহার মনের বিকার মাত্র। বরং চন্দ্রালোকে কিঞ্চিৎ সন্তাপ আছে; সেটুকু এত অল্প যে, তাহা আমাদিগের স্পর্শের অনুভবনীয় নহে। কিন্তু জান্তেদেশী, মেলনি, পিয়াজি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন।

২. কেন না, বায়ু নাই।

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা

প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা

উভয়েই ঋষিকন্যা; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষি-পালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনীগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণ-পথে আসিল;

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ।।

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন,

Full many a lady
I have eyed with best regard, and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too diligent ear: for several virtues
Have I like several women;
................................but you, O you,
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best!

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা, সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভাল বাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই; কেন না, তাঁহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা বল্কল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জলসিঞ্চন করিয়া, দিনপাত করিয়াছেন—সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তাঁহার ভগিনীস্নেহ, নব মল্লিকার উপর; ভ্রাতৃস্নেহ, সহকারের উপর; পুত্রস্নেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমনকালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন

তাহাদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্‌গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord how it looks about! Believe me, sir,
It carries a brave form. But 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এ জন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বলিতেছে,

O dear father,
Make not too rash a trial of him, for
He's gentle and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections
Are then most humble: I have no ambition
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশূন্য ছিল; কেন না, শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবনমধ্যে—এক স্থানে কণ্বের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন।

কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি, তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্ পৃথক্ কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুষ্মন্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা; কিন্তু দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক, সখীদ্বয় যত দিন তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

স্নিগ্ধংবীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া রুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসূয়মুক্তা সখী,
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো! কামঃ স্বতাং পশ্যতি।।

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শনকালে মিরন্দা অসঙ্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

This
Is the third man that e'er I saw, the first
That e'er I sigh'd for

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা। "সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন?"—"তবে, আমি উঠিয়া যাই"—"আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই"—শকুন্তলার এ সকল "বাহানা" আছে; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখি—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল—সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

By my modesty,
The jewel in my dower, I would not wish
Any companion in the world but you;

Nor can imagination form a shape,
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চ :—

Hence, bashful cunning!
And prompt me, plain and holy innocence!
I am your wife, if you will marry me;
If not, I'll die your maid : to be your fellow
You may deny me; But I'll be your servant,
Whether you will or no.

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন, উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, ''আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর,'' মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্ চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্তপর্য্যন্তপ্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা ''অদ্ধপধে সুমরিঅ এদস্ম হত্থভ্ভংসিণো মিণালবলঅস্ম কদে পড়িণিবুত্তহ্মি।'' ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে—

''ননু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।'' এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, ''অসন্তোসে উণ কিং করেদি?''—এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্ত্তি—অপ্রথিতযশাঃ, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত-মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম করারূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন, তিনি শকুন্তলা-চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল

না ; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম ; কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য্য, রমণীর স্নেহ কই ? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা ; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র ; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয়—"অসন্তোসে উণ কিং করেদি ?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল—"অনার্য্য ! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ ?"—সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ, কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী ; এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে ? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এ স্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

দ্বিতীয়, শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা-চরিত্রের একভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সে ভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেস্‌দিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গৌতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেস্‌দিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে—

ণাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধু
একক্কস্মঅ চরিত্র ভণাদু কিং একএক্কস্মিং ॥

তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—উভয়েরই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, তাহা দেস্‌দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে

অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার সশরীরে স্বর্গারোহণপথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ তত্ত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্‌দিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া—কেন না, দুই নায়িকারই ''দুরারোহিণী আশালতা'' পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামিকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচারপরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে; কেন না মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্ প্রকারে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেস্‌দিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল, শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুই চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুই জনে তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু, মাধু যে সকল নাটক উপন্যাস নবন্যাস [illegible]তন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর ''অয়মহম্ভোঃ'' শুনিতে পান নাই! সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া দেস্‌দিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি—প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্‌দিমোনা গরীয়সী। স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্ব্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, ''অনার্য্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?'' যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন, ''ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে,'' তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,

তুহ্মে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মত্থিদিঞ্চ লোঅস্স।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥

এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্‌দিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, ''আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।'' বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই ''প্রভু!'' বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে

কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্‌দিমোনা "আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন," ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,

O good Iago,
What shall I do to win my lord again?
Good friend go to him; for, by this light of heaven,
I know not how I lost him. Here I kneel:

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে "বধ করিব!" বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।" যখন দেস্‌দিমোনা, মরণভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, এক দিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্ত্তজন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, যখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য্য কে করিল?" তখনও দেস্‌দিমোনা বলিলেন, "কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম।" তখনও দেস্‌দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে—কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্য্যাপ্ত, স্তূপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর দুস্তর চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষ্যাদি বাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল ঊর্ম্মিলীলা,—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীতি—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেস্‌দিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয় নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে—তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত

ফষ্ট এবং বাইরণ প্রণীত মানফ্রেড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক—এ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না; কেন না, এরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অতুল্য বলিলে হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্‌দিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্‌দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না—যথা

> ন তির্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং,
> বচোঽতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
> হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
> প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।

[১২৮২ বৈশাখ। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

দ্রৌপদী

কি প্রাচীন, কি আধুনিক, হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনকদুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্য্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ—সীতার অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্য্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বলিতেছি না—কিন্তু সীতানুবর্ত্তিনী নায়িকারই বাহুল্য। আজিও যিনি সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিদ্যা প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন।

ইহার কারণও দুরনুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আর্য্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আর্য্যস্ত্রীগণের এই জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ত।

একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন; কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে, পতি এক হৌক, পাঁচ হৌক, পতিমাত্র ভজনাই সতীত্ব। উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুন্নমতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং গুরুজনের বাধ্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল গুণগুলিন পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণসকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্য বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।

দ্রৌপদীচরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দুরূহ; কেন না, মহাভারত অনন্ত সাগরতুল্য, তাহার অজস্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় যায়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ কে করিতে পারে! তথাপি দুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত্ন করিতেছি।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। দ্রুপদরাজার পণ যে, যে সেই দুর্ব্বেধনীয় লক্ষ্য বিঁধিবে, সেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, ঋষিগণ সমবেত। এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারীকুসুম শুকাইয়া উঠে; সেই বিশোষ্যমাণা কুমারী লাভার্থ দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীরসকল লক্ষ্য বিঁধিতে যত্ন করিতেছেন। একে একে সকলেই বিন্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। হায়! দ্রৌপদীর বিবাহ হয় না।

অন্যান্য রাজগণমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করিতেন বলা যায় না—কেন না, এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন, পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্যবিন্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন। কিন্তু মহাভারতের মহাকবি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীর্য্য, তাঁহার প্রধান নায়ক অর্জ্জুনের বীর্য্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অর্জ্জুনহস্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জ্জুনের গৌরবের এত আধিক্য; কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য্য করিলে অর্জ্জুনের গৌরব কোথা থাকে? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুদ্র কবিকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন যে, তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই—কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষতি হয়—তাহা তিনি বুঝিবেন না—সকল রাজাই যেখানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লোভে লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণই যে কেন একা উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলাক্রমে কর্ণকে লক্ষ্যবিন্ধনে উত্থিত করিলেন, কর্ণের বীর্য্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, এবং সেই অবসরে, সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন। যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদীকর্ত্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্য্যোধনের সভাতলে দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ডপ্রতাপসমন্বিতা মহাসভায় কুমারীকুসুম শুকাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদরাজতুল্য পিতার, ধৃষ্টদ্যুম্নতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিন্ধনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না"। এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল, শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এ স্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না—দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গর্ব্বিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজদুহিতার দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল।

ইহার পর দ্যূতক্রীড়ায় বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগর্ব্বিত, তেজস্বী, এবং বলধারী ভীমার্জ্জুন দ্যূতমুখে বিসর্জ্জিত হইয়াও কোন কথা কহেন নাই; শত্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এ স্থলে তাঁহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কর্ত্তব্য? স্বামিকর্ত্তৃক দ্যূতমুখে সমর্পিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্য্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দ্যূতবার্ত্তা এবং দুর্য্যোধনের সভায় তাঁহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন,

"হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে, কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এ স্থানে আগমনপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও। ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।" দ্রৌপদীর অভিপ্রায়, দাসত্ব স্বীকার করিবেন না।

দ্রৌপদীর চরিত্রের দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, ধর্ম্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। মহাভারতকার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন। ভীমসেনে, অর্জ্জুনে, অশ্বত্থামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়চরিত্রে এতদুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায়, এবং অর্জ্জুনে ও অশ্বত্থামায় অর্দ্ধমাত্রায় দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দ্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দ্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অর্জ্জুন এবং অভিমন্যুতে ইহা আত্মশক্তিনিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহা বলবৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল; দ্রৌপদীতে ইহা ধর্ম্মবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে।

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দুঃশাসনকে বলিলেন, "যদি ইন্দ্রাদি দেবগণ তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।" স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বসমীপে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "ভারতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" ভীষ্মাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম—দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই।" কিন্তু অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে! মহাভারতের কবি, মনুষ্যচরিত্র-সাগরের তল পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলিল, দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না—ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, "হা, নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি—আমাকে উদ্ধার কর!" এ স্থলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ।

দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও অসামান্য—যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী

ধর্ম্মানুরাগিনী আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মানুরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ। এই অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার বরগ্রহণ কালে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সে স্থানটি এত সুন্দর যে, যিনি তাহা শত বার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অসুখী হইবেন না। এ জন্য সেই স্থানটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

''হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

''দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়; কেন না, প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণকর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

''দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

''দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।''

এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্ব্বের সুসামঞ্জস্যই দ্রৌপদীচরিত্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ। যখন জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণমানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধর্ম্মাচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ন করেন; পরে জয়দ্রথ আপনার দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই তেজোগর্ব্ব বচনপরম্পরা পাঠে মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে। জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভীমার্জ্জুনের

পত্নী, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিন্ধুসৌবীরাধিপতি ভূতলে পাতিত হয়েন।

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্ব্বার বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন ; তখন দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীরনারীর কার্য্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই করিলেন না ; অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকারী স্বামিগণের উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা করিলেন না ; কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ব্বিত বচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রমে স্বামিদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগ্য।

[১২৮২ ভাদ্র। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

সাম্য/স্ত্রীজাতি

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি। কৃষকে ও ভূম্যধিকারীতে যে বৈষম্য, সাম্যনীতিভ্রংশের প্রথম উদাহরণ স্বরূপ তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় উদাহরণ স্বরূপ স্ত্রীপুরুষে যে বৈষম্য, তাহার উল্লেখ করিব।

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান্, স্ত্রী অবলা; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু; পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা; ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেন না, যে যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে না।

ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সাম্যতত্ত্বের মূলোচ্ছেদক। দেখ, স্ত্রীপুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ বাঙ্গালিতেও সেইরূপ। ইংরেজ বলবান্, বাঙ্গালি দুর্ব্বল; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালি ভীরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙ্গালি কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকারবৈষম্য ন্যায্য হইত, তবে আমরা ইংরেজ বাঙ্গালি মধ্যে সামান্য অধিকারবৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালি দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে অধিকারবৈষম্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। বিখ্যাতনামা জন ষ্টুয়ার্ট মিলকৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে, এই বিষয়টি সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা এখানে পুনরুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন।[১]

স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী। যে দেশে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া না রাখে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রকারে

---

১. Subjection of Women.

আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া মন যোগাইয়া থাকিতে হয়।

এই প্রথা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে চিরপ্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায় সমাজতত্ত্ববিদ্ ইহার বিরোধী। তাঁহারা সাম্যবাদী। তাঁহাদের মত এই যে, স্ত্রী ও পুরুষে সর্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে অধিকার, স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার থাকাই উচিত। পুরুষে চাকরি করিবে, ব্যবসায় করিবে, স্ত্রীগণে কেন করিবে না? পুরুষে রাজসভায়, ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইবে, স্ত্রীলোকে কেন হইবে না। নারী পুরুষের পত্নী মাত্র, দাসী কেন হইবে?

আমাদের দেশে যে পরিমাণে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার শতাংশও নহে। আমাদিগের দেশ অধীনতার দেশ, সর্ব্বপ্রকার অধীনতা ইহাতে বীজমাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, উব্বর্রা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এখানে প্রজা যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে অশিক্ষিত যেমন শিক্ষিতের আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে যেমন শূদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যত্র কেহই ধর্ম্মযাজকের তাদৃশ বশবর্ত্তী নহে। এখানে যেমন দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, অন্যত্র তত নহে।

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতাস্বরূপ; দেবতাস্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এত দূর যে, পত্নীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।

এই আর্য্য পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অতি সুন্দর; ইহার জন্য আর্য্যগৃহ স্বর্গতুল্য সুখময়। কিন্তু পাতিব্রত্যের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্যা, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রতিবাদী।

অস্মদ্দেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজমধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে। সে কয়টি বিষয় এই—

১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা, অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা থাকে।

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অধিকারী। কিন্তু স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; বরং সর্ব্বভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে বাধ্য।

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকে গৃহপ্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না।

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামিগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্ত্তমানেই, যথেচ্ছ বহুবিবাহ করিতে পারেন।

১। প্রথম তত্ত্ব সম্বন্ধে, সাধারণ লোকেরও একটু মত ফিরিয়াছে। সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটি কথামালা সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম-এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেক মাত্রও মনে স্থান দেন না। যদি কেহ, তাঁহাদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে অনেকেই প্রশ্নকর্ত্তাকে বাতুল মনে করিবেন। কেহ প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, মেয়ে অত লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে? চাকরি করিবে না কি? যদি সাম্যবাদী সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলেন, "কেনই বা চাকরি করিবে না?" তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা হরিবোল দিয়া উঠিবেন। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উত্তর করিতে পারেন, ছেলের চাকরিই যোটাইতে পারি না, আবার মেয়ের চাকরি কোথায় পাইব? যাঁহারা বুঝেন যে, বিদ্যোপার্জ্জন কেবল চাকরির জন্য নহে, তাঁহারা বলিতে পারেন, "কন্যাদিগকে পুত্রের ন্যায় লেখাপড়া শিখাইবার উপায় কি? তেমন স্ত্রীবিদ্যালয় কই?"

বাস্তবিক, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখাপড়া শিখাইবার উপায় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজমধ্যে সাম্যতত্ত্বান্তর্গত এই নীতিটি যে অদ্যাপি পরিস্ফুট হয় নাই—লোকে যে স্ত্রীশিক্ষার কেবল মৌখিক সমর্থন করিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ। সমাজে কোন অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়—সমাজ কিছু চাহিলেই তাহা জন্মে। বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত।

সেই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়—দ্বিতীয়, পুরুষবিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা।

দ্বিতীয়টির নামমাত্রে, বঙ্গবাসিগণ জ্বলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহে মনে বিবেচনা করিবেন যে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাঙ্গনাবৎ আচরণ করিবে। মেয়েগুলা ত অধঃপাতে যাইবেই; বেশীর ভাগ ছেলেগুলাও যথেচ্ছাচারী হইবে।

প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপত্তি ঘটে না বটে, কিন্তু আপত্তির অভাব নাই। মেয়েরা মেয়েকালেজে পড়িতে গেলে পর, শিশু পালন করিবে কে? বালককে স্তন্যপান করাইবে কে? গৃহকর্ম্ম করিবে কে? বঙ্গীয় বালিকা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মাতা ও গৃহিণী হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে যে লেখাপড়া শিখা যাইতে পারে, তাহাই তাহাদের সাধ্য। অথবা তাহাও সাধ্য নহে—কেন না, ত্রয়োদশ বর্ষেই বা কুলবধূ বা কুলকন্যা,. গৃহের বাহির হইয়া বই হাতে করিয়া কালেজে পড়িতে যাইবে কি প্রকারে?

আমরা এ সকল আপত্তির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই। আমরা দেখাইতে চাই যে, যদি তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ববিষয়ক

সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পার, ততদিন কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পারিবে না। সাম্যতত্ত্বান্তর্গত সমাজনীতি সকল পরস্পরে দৃঢ় সূত্রে গ্রন্থিত, যদি স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বত্র সমানাধিকারবিশিষ্ট হয়, তবে ইহা স্থির যে, কেবল শিশুপালন ও শিশুকে স্তন্যপান করান স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা একা স্ত্রীরই ভাগ নহে। যাহাকে গৃহধর্ম্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ । একজন গৃহকর্ম্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহকর্ম্মের দুঃখে অব্যাহতি পাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় নির্ব্বিঘ্ন হইবে, ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত নহে। অপরঞ্চ পুরুষগণ নির্ব্বিঘ্নে যেখানে সেখানে যাইতে পারে, এবং স্ত্রীগণ কোথাও যাইতে পারিবে না, ইহা কদাচ সাম্যসঙ্গত নহে। এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বলিয়াই বিদ্যাশিক্ষাতেও বৈষম্য ঘটিতেছে। বৈষম্যের ফল বৈষম্য। যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে ক্রমে ছোট হইতে হইবে।

কথাটি আর এক প্রকারে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে।

স্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কি না ? বোধ হয়, সকলেই বলিবেন, "বিধেয় বটে।"

তারপর জিজ্ঞাস্য, কেন বিধেয় ? কেহ বলিবেন না যে, চাকরির জন্য।[১] বোধ হয়, এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন যে, স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখান উচিত।

তারপর, জিজ্ঞাস্য যে, পুরুষগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে হয় কেন ? দীর্ঘকর্ণ দেশীয় গর্দ্দভশ্রেণী বলিবেন, চাকরির জন্য, কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তর গণনীয়ের মধ্যে নহে। অন্যে বলিবেন, নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জ্জন, এবং বুদ্ধি মার্জ্জনের জন্যই পুরুষের লেখাপড়া শিক্ষা প্রয়োজন। অন্য যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন নহে। গৌণ প্রয়োজনও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান।

অতএব বিদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অধিকারের সাম্য স্বীকার করিতে হইল। এ সাম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ উপরিকথিত বিচারে অবশ্য কোথাও ভ্রম আছে। যদি এখানে সাম্য স্বীকার কর, তবে অন্যত্র সে সাম্য স্বীকার কর না কেন ? শিশুপালন, যথেচ্ছা ভ্রমণ, বা গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে সে সাম্য স্বীকার কর না কেন ? সাম্য স্বীকার করিতে গেলে, সর্ব্বত্র সাম্য স্বীকার করিতে হয়।

উপরে যে চারিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয়। বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। তবে ইহা বলিতে পারি যে, কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর ; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত ; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর

---

১. সাম্যবাদী বলেন, চাকরির জন্যও বটে।

দিব না। আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভাল বাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা, স্নেহময়ী, সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্ব্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, "যদি" পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ উচিত? উচিত, অনুচিত, স্বতন্ত্র কথা; ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।

অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন না। যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়। তবেই, এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্মক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণ বুঝা যায়; বিধানের কর্ত্তা পুরুষজাতি সে সকলের প্রচলনে আপনাদিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াসসাধ্য নহে, কাহারও অনিষ্টকর নহে, এবং অনেকের সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়।

আর একটি কথা আছে। অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দু স্ত্রীমাত্রেই জানেন যে, এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্যসুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না

কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হইবে। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?

তুমি বিধানকর্ত্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর, এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বৈষম্য।

৩য়। কিন্তু পুরুষের যত প্রকার দৌরাত্ম্য আছে, স্ত্রীপুরুষে যত প্রকার বৈষম্য আছে, তন্মধ্যে আমাদিগের উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য, অধর্ম্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে। কেন? হুকুম পুরুষের।

এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ, অমর্য্যাদা ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চর্ম্মচক্ষে দেখিবে! কি অপমান! কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? কিছু লজ্জা নাই? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া, আমি লজ্জায় মরি!

জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার কি অধিকার? তাহারা কি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তোমারই তৈজসপত্রাদিমধ্যে গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল? তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছুই নহে?

আমি জানি, তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে এরূপ তৈয়ার করিয়াছ যে, তাহারা এখন আর এই শাস্তিকে দুঃখ বলিয়া বোধ করে না। বিচিত্র কিছুই নহে। যাহাকে অর্দ্ধভোজনে অভ্যস্ত করিবে, পরিশেষে সে সেই অর্দ্ধভোজনেই সন্তুষ্ট থাকিবে, অন্নাভাবকে দুঃখ মনে করিবে না। কিন্তু তাহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা মার্জ্জনীয় হইল না। তাহারা সম্মত হউক, অসম্মতই হউক, তুমি তাহাদিগের সুখ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি অনন্ত কাল মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইবে।

আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, তাঁহাদিগের শুধু এইরূপ আপত্তি নহে। তাঁহারা বলেন যে, স্ত্রীগণ সমাজমধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিলে দুষ্টস্বভাব হইয়া উঠিবে, এবং কুচরিত্র পুরুষগণ অবসর পাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবে। যদি তাঁহাদিগকে বলা যায় যে, দেখ, ইউরোপাদি সভ্যসমাজে কুলকামিনীগণ যথেচ্ছা সমাজে বিচরণ

করিতেছে, তন্নিবন্ধন কি ক্ষতি হইতেছে? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন যে, সে সকল সমাজের স্ত্রীগণ, হিন্দুমহিলাগণ অপেক্ষা ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং কলুষিতস্বভাব বটে।

ধর্ম্মরক্ষার্থ যে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরনিবদ্ধ রাখা আবশ্যক, হিন্দুমহিলাগণের এরূপ কুৎসা আমরা সহ্য করিতে পারি না। কেবল সংসারে লোকসহবাস করিলেই তাহাদিগের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, পুরুষ পাইলেই তাহারা কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিবে, হিন্দু স্ত্রীর ধর্ম্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ নহে। যে ধর্ম্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ, সে ধর্ম্ম থাকা না থাকা সমান—তাহা রাখিবার জন্য এত যত্নের প্রয়োজন কি? তাহার বন্ধনভিত্তি উন্মূলিত করিয়া নূতন ভিত্তির পত্তন কর।

৪র্থ। আমরা চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ পুরুষগণের বহুবিবাহে অধিকার, তৎসম্বন্ধে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন যে, এই অধিকার নীতিবিরুদ্ধ। সহজেই বুঝা যাইবে যে, এ স্থলে স্ত্রীগণের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া সাম্য সংস্থাপন করা সমাজসংস্কারকদিগের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; পুরুষগণের অধিকার কর্ত্তন করাই উদ্দেশ্য; কারণ, মনুষ্যজাতিমধ্যে কাহারই বহুবিবাহে অধিকার নীতিসঙ্গত হইতে পারে না।[১] কেহই বলিবে না যে, স্ত্রীগণও পুরুষের ন্যায় বহুবিবাহে অধিকারিণী হউন; সকলেই বলিবে, পুরুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার। অতএব, যেখানে অধিকারটি নীতিসঙ্গত, সেইখানেই সাম্য অধিকারকে সম্প্রসারিত করে, যেখানে কার্য্যাধিকারটি অনৈতিক, সেখানে উহাকে কর্ত্তিত এবং সঙ্কীর্ণ করে। সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পারে না। সাম্য এবং স্বানুবর্ত্তিতা, এই দুই তত্ত্বমধ্যে সমুদায় নীতিশাস্ত্র নিহিত আছে।

এই চারিটি বৈষম্যের উপর আপাততঃ বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা অতি গর্হিত, তাহারই যখন কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের প্রতি কটাক্ষ করিলে কোন উপকার হইবে, এমত ভরসা করা যায় না। আমরা আর দুই একটি কথার উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইব।

স্ত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্ব্বসমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুত্র কন্যা, উভয়েরই এক ঔরসে, এক গর্ভে জন্ম; উভয়েরই প্রতি পিতা মাতার এক প্রকার যত্ন, এক প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু পুত্র পিতৃমৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করুক,

---

১. কদাচিৎ হইতে পারে বোধ হয়। যথা, অপুত্রক রাজা, অথবা যাহার ভার্য্যা কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত। বোধ হয় বলিতেছি, কেন না, ইহা স্বীকার করিলে পুরুষের বিপক্ষেও, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। বস্তুতঃ বহুবিবাহ পক্ষে বলিবার দুই একটা কথা আছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় বহুবিবাহ এমন কদর্য্য প্রথা যে, সে সকল কথার উল্লেখ মাত্রেও অনিষ্ট আছে।

কন্যা বিশেষ প্রয়োজনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দ্দক পাইতে পারে না। এই নীতির কারণ হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকারী ; সেটি এরূপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ যে, তাহার অযৌক্তিকতা নির্ব্বাচন করাই নিষ্প্রয়োজন। দেখা যাউক, এরূপ নিয়মের স্বভাবসঙ্গত অন্য কোন মূল আছে কি না। ইহা কথিত হইতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায়ই অধিকারিণী ; এবং তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী, স্বামীর ধনৈশ্বর্য্যে কর্ত্রী, অতএব তাঁহার আর পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি ইহাই এই ব্যবস্থানীতির মূলস্বরূপ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিধবা কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন ? যে কন্যা দরিদ্রে সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন ? কিন্তু আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি। স্ত্রীকে স্বামী বা পুত্র বা এবম্বিধ কোন পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না—পরের দাসী হইয়া ধনী হইবে—নচেৎ ধনী হইবে না, ইহাতেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, পতি দুষ্ট হউক, কুভাষী, কদাচার হউক, সকল সহ্য কর—অবাধ্য, দুর্ম্মুখ, কৃতঘ্ন, পাপাত্মা পুত্রের বাধ্য হইয়া থাক—নচেৎ ধনের সঙ্গে স্ত্রীজাতির কোন সম্বন্ধ নাই। পতি পুত্র তাড়াইয়া দিল ত সব ঘুচিল। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার উপায় নাই—সহিষ্ণুতা ভিন্ন অন্য গতি নাই। এদিকে পুরুষ, সর্ব্বাধিকারী—স্ত্রীর ধনও তাঁর ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্ব্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে কোন বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং নীতিবিরুদ্ধ।

অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাপ্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবর্ত্তিনী থাকে। বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই ; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষপদমূলে স্থাপিত কর—পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারে। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্ত্তিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্ছনীয় ; পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্ত্তী হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন ? যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন ? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র ? না রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া, স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন ? ইহা যদি অধর্ম্ম না হয়, তবে অধর্ম্ম কাহাকে বলে, বলিতে পারি না।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথা—পতি অপুত্রক মরিলে। এইটুকু হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব। এইরূপ বিধি দুই একটা থাকাতেই আমরা প্রাচীন আর্য্যব্যবস্থাশাস্ত্রকে কোন কোন অংশে আধুনিক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু এটুকু কেবল মন্দের ভাল মাত্র। স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী বটে, কিন্তু দানবিক্রয়াদির অধিকারিণী নহে। এ অধিকার কতটুকু ? আপনার ভরণপোষণ

মাত্র পাইবেন, আর তাঁহার জীবনকালমধ্যে আর কাহাকেও কিছু দিবেন না, এই পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার। পাপাত্মা পুত্র সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করুক, তাহাতে শাস্ত্রের আপত্তি নাই, কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠা স্ত্রী কাহারও প্রাণরক্ষার্থেও এক বিঘা হস্তান্তর করিতে সমর্থ নহেন। এ বৈষম্য কেন? তাহার উত্তরের অভাব নাই—স্ত্রীগণ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরমতি, বিষয়রক্ষণে অশক্ত। হঠাৎ সর্ব্বস্ব হস্তান্তর করিবে, উত্তরাধিকারীর ক্ষতি হইবে, এ জন্য তাহারা বিষয় হস্তান্তর করিতে অশক্ত হওয়াই উচিত। আমরা এ কথা স্বীকার করি না। স্ত্রীগণ বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, চতুরতায় পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। বিষয়রক্ষার জন্য যে বৈষয়িক শিক্ষা, তাহাতে তাহারা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সে পুরুষেরই দোষ। তোমরা তাহাদিগকে পুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, বিষয়কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহাদিগের বৈষয়িক শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বৈষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা করিও। আগে মুড়ি রাখিয়া পরে পাঁটা কাটা যায় না। পুরুষের অপরাধে স্ত্রী অশিক্ষিতা—কিন্তু সেই অপরাধের দণ্ড স্ত্রীগণের উপরেই বর্ত্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়!

স্ত্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। কয় বৎসর পূর্ব্বে হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিচার্য্য বিষয় এই—অসতী স্ত্রী, বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না। বিচারক অনুমতি করিলেন, পারে। শুনিয়া দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যা! এতকালে হিন্দুস্ত্রীর সতীত্বধর্ম্ম লুপ্ত হইল! আর কেহ সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিবে না! বাঙ্গালি সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না—রাজাজ্ঞা নহিলে চাঁদায় সহি করে না, কিন্তু এ লাঠি এমনি মর্ম্মস্থানে বাজিয়াছিল যে, হিন্দুগণ আপনা হইতেই চাঁদাতে সহি করিয়া, প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করিতে উদ্যত! প্রধান প্রধান সম্বাদপত্র, ''হা সতীত্ব! কোথায় গেলি'' বলিয়া ইংরেজি বাঙ্গালা সুরে রোদন করিয়া, ''ওরে চাঁদা দে!'' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শেষটা কি হইয়াছে জানি না; কেন না, দেশী সম্বাদপত্র পাঠসুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত। কিন্তু যাহাই হউক, যাঁহারা এই বিচার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভাল হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে? বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগকে সতী করিতে চাও—সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্ম্মভ্রষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না; ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ,—যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে সকলেই বিষয় পাইবে; কেন না, সে পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না; কেন না, সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্ম্মশাস্ত্র, তবে অধর্ম্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ চাঁদা তোলা যদি দেশবাৎসল্য, তবে মহাপাতক কেমনতর?

স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাঁধন বাঁধিতে পার, ততই ভাল, কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ বারস্ত্রীগমন করুক, পরদারনিরত হউক, তাহার কোন শাসন নাই কেন? শাস্ত্রে ভূরি ভূরি নিষেধ আছে; সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল অতি মন্দ কর্ম্ম, লোকেও একটু একটু নিন্দা করিবে—কিন্তু এই পর্য্যন্ত। স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দণ্ড নাই। একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয় স্বজন তাহাতে বিষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য্য করিয়া রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে আসেন; পত্নী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোকসমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাঁহার সহিত কোন প্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না; এবং তাঁহার কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন। এই আর একটি গুরুতর বৈষম্য।

আর একটি অনুচিত বৈষম্য এই যে, সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক ভিন্ন, এদেশীয় স্ত্রীগণ উপার্জ্জন করিতে পারে না। সত্য বটে, উপার্জ্জন-কারী পুরুষেরা আপন আপন পরিবারস্থা স্ত্রীগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। কিন্তু এমন স্ত্রী অনেক এ দেশে আছে যে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করে, এমন কেহই নাই। বাঙ্গালার বিধবা স্ত্রীগণকে বিশেষতঃ লক্ষ্য করিয়াই আমরা লিখিতেছি। অনাথা বঙ্গবিধবাদিগের অন্নকষ্ট লোকবিখ্যাত, তাহার বিস্তারে প্রয়োজন নাই। তাহারা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারে না, ইহা সমাজের নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। সত্য বটে, দাসীত্ব বা পাচিকাবৃত্তি করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রী কন্যা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম নয়—তদপেক্ষা মৃত্যুতে যন্ত্রণা অল্প। অন্য কোনপ্রকারে ইহারা যে উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তাহারা দেশী সমাজের রীত্যনুসারে গৃহের বাহির হইতে পারে না। গৃহের বাহির না হইলে উপার্জ্জন করার অল্প সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, এ দেশীয় স্ত্রীগণ লেখাপড়া বা শিল্পাদিতে সুশিক্ষিতা নহে; কোনপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত না হইলে কেহ উপার্জ্জন করিতে পারে না। তৃতীয়, বিদেশী উমেদওয়ার এবং বিদেশী শিল্পীরা প্রতিযোগী; এ দেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প বা বাণিজ্যে অন্ন করিয়া সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার উপর স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়া কি করিবে?

এই তিনটি বিঘ্ন নিরাকরণের একই উপায়—শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এ দেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী,

বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক্, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।

আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়া। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাঁহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয় জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই। দেশে অনেক এসোসিয়েশন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লাব, ইত্যাদি আছে—কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহার উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসী, স্ত্রীজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। আমরা কয় দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গসংসাররূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি?

যায় না; কেন না, তাহাতে রঙ্ তামাসা কিছু নাই। কিছু করা যায় না; কেন না, তাহাতে রায় বাহাদুরি, রাজা বাহাদুরি, ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?

[১২৮২ কার্ত্তিক। *'সাম্য'*]

লোকশিক্ষা

লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্যই নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্দ্বারা প্রস্তর পর্য্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহমাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য্য হয়। বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধিপ্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে।

ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা। আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাঁদ স্কোয়ার পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজী-নবীশ সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন।

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রুসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা এ দেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না।

এ দেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সম্বাদপত্র; কোনখানির গ্রাহক দুই শত, কোনখানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপত্র শত শত, সহস্র সহস্র। এক একখানির গ্রাহক সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক। তার পর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা। যাহা কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত

করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার শত শত সম্বাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই স্বাদু খাদ্য চর্ব্বণ করিতে করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশের যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দ্দশার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক্ দিয়াও যায় না; তাহার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে; আর বক্তৃতাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়।

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এ দেশে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের কূট তর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র করে; মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে—গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দিগ্বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম্ম শিখাইলেন—লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সে দিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিঁড়ীর উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্ নাদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদালঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তূলা পেঁজে, যে কাট্না কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্বপালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে,

যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। গুল্‌কি কাওরানী শূয়ার চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে।/তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হবে? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রাণ্ডি টানিয়া, থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজী শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব, এ দেশে সার্ অস্‌লি ইডেন্, ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয়কোটি ঊনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাট লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।

[১২৮৫ অগ্রহায়ণ। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

রামধন পোদ

বাঙ্গালার সাহিত্যারণ্যে একই রোদন শুনিতে পাই—বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। এই অভিনব অভ্যুত্থানকালে বাঙ্গালীর ভগ্ন কণ্ঠে একই অস্ফুট বোল—"হায়! বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই।" বাঙ্গালীর যত দুঃখ, তার একই মূল—বাহুতে বল নাই।

যদি অনুসন্ধান করা যায়, বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই কেন? তাহার একই উত্তর পাইব—বাঙ্গালী খাইতে পায় না—বাঙ্গালায় অন্ন নাই। যেমন এক মার গর্ভে বহু সন্তান হইলে কেহই উদর পুরিয়া স্তন্য পায় না, তেমনি আমাদের জন্মভূমি বহুসন্তানপ্রসবিনী বলিয়া, তাঁহার শরীরোৎপন্ন খাদ্যে সকলের কুলায় না। পৃথিবীর কোন দেশই বুঝি বাঙ্গালার মত প্রজাবহুলা নহে। বাঙ্গালার অতিশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার অবনতির কারণ। প্রজাবাহুল্য হইতে অন্নাভাব, অন্নাভাব হইতে অপুষ্টি, শীর্ণশরীরত্ব, জ্বরাদি পীড়া এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য।

অনেকে বলিবেন—দেখ, দেশে অনেক বড়মানুষের ছেলে আছে—তাহাদের আহারের কোন কষ্ট নাই, কিন্তু কই, তাহারা ত অনাহারী চণ্ডাল পোদের অপেক্ষাও দুর্ব্বল—বড় মানুষের ছেলেরাই প্রকৃত মর্কটাকার। সত্য বটে, কিন্তু এক পুরুষে অন্নাভাবের দোষ খণ্ডে না। যাহারা পুরুষানুক্রমে মর্কটাকার, দুই এক পুরুষ তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই মনুষ্যাকার ধারণ করে না। বিশেষ, বড়মানুষের ছেলের কথা ছাড়িয়া দাও—তাঁহারা নড়িয়া বসেন না—সুতরাং ক্ষুধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান না—ভুক্ত আহার জীর্ণ করিতে পারেন না। সকল দেশেই বাবুর দল মর্কটসম্প্রদায়বিশেষ। শ্রমজীবী, সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহুবলই দেশের বাহুবল।

আবার অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, "এ রকম কঠিনহৃদয় মাল্‌থসি বুলি রাখিয়া দাও! ও ছাই আমরা অনেক বার শুনিয়াছি। কেন, যদি দেশে খাবার কুলায় না, তবে ভিন্ন দেশে এত চাউল গম রপ্তানি হয় কি প্রকারে?" এ সম্প্রদায়ের লোকে বুঝেন না যে, দেশে অকুলান থাকিলেও বিদেশে জিনিষ রপ্তানি হইতে পারে। যে আমায় বেশী টাকা দিবে, তাহাকেই আমি জিনিষ বেচিব।

যদি এ দেশে কোন খাদ্য কুলান হয়, তবে সে চাউল। চাউল জুটিল না বলিয়া খাইতে পাইল না—এরূপ দুরবস্থা যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এ দেশে নিতান্ত অল্প। অধিকাংশ লোকের আর যাহারই অভাব থাক না কেন, চাউলের অপ্রতুল নাই। পেট ভরিয়া প্রায় সকলেই ভাত খাইতে পায়। কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাইতে

পাইলেই আহার হইল না। শুধু ভাতে জীবন রক্ষা হইলেই হইতে পারে—কিন্তু সে জীবনরক্ষা মাত্র। শরীরের পুষ্টি হয় না। চাউলে বলকারক সার পদার্থ শতাংশে সাত ভাগ আছে মাত্র। চরবি—যাহা শরীরপুষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, চাউলে তাহা কিছু মাত্র নাই।

শুধু ভাত খায়, এমন লোক অতি অল্প না হউক, বেশীও নয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকে ভাতের সঙ্গে একটু ডালের ছিটা, একটু মাছের বিন্দু, শাক বা আলু কাঁচকলার কণিকা দিয়া ভোজন করে। ইহার নাম ''ভাত ব্যঞ্জন''। এই ভাত ব্যঞ্জনের মধ্যে ভাতের ভাগ পনের আনা সাড়ে ঊনিশ গণ্ডা—ব্যঞ্জনের ভাগ দুই কড়া। সুতরাং ইহাকেও শুধু ভাত বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার চৌদ্দ আনা লোক এইরূপ শুধু ভাত খায়। তাহাতে কোন উপসর্গ না থাকিলে জীবনরক্ষা হইতে পারে—হইয়াও থাকে। কিন্তু এরূপ শরীরে রোগ অতি সহজেই প্রাধান্য স্থাপন করে,—(সাক্ষী মালেরিয়া জ্বর)—আর এরূপ শরীরে বল থাকে না। সেই জন্য বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকে বলেন, যত দিন না বাঙ্গালী সাধারণতঃ মাংসাহার করে, তত দিন বাঙ্গালীর বাহুতে বল হইবে না। আমরা সে কথা বলি না। মাংসের প্রয়োজন নাই; দুগ্ধ, ঘৃত, ময়দা, ডাল, ছোলা, ভাল শব্জী, ইহাই উত্তম আহার। দৃষ্টান্ত—পশ্চিমে হিন্দুস্থানী। নৈবেদ্যে বিল্বপত্রের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শমাত্রের পরিবর্ত্তে, অন্নের সঙ্গে ইহাদের যথোচিত সমাবেশ হইলেই বলকারক আহার হইল। বাঙ্গালী যদি ভাতের মাত্রা কমাইয়া দিয়া, এই সকলের মাত্রা বাড়াইতে পারে, তবে এক পুরুষে নীরোগ, দুই তিন পুরুষে বলিষ্ঠকায় হইতে পারে।

আমি এই সকল কথা রামধন পোদকে বুঝাইতেছিলাম—কেন না, রামধন পোদের সাতগোষ্ঠী বড় রোগা। রামধন আমার কাছে হাত যোড় করিয়া বলিল, ''মহাশয় যা আজ্ঞা কর্‌লেন, তা সবই যথার্থ—কিন্তু ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা! বাবা, এ সকল পাব কোথায়? এমনই যে শুধু ভাতের খরচ জুটিয়ে উঠিতে পারি না।''

কথাটা দেখিলাম সত্য। আমি রামধনের ঢেঁকিশালে ঢেঁকির উপর বসিয়াছিলাম—উঠানে একটা ঘেও কুকুর পড়িয়াছিল বলিয়া আর আগু হইতে পারি নাই—সেইখান হইতেই রামধনের বংশাবলীর পরিচয় পাইতেছিলাম। রামধন একটি একটি করিয়া দেখাইল যে, তাহার চারিটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে; একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের বিবাহ দিতে বাকি আছে—পোদজেতের ছেলের বিয়েতেও কড়ি খরচা, মেয়ের বিয়েতেও বটে—তবে কম। পোদ বলিল যে, ''মহাশয় গা! একটু পরিবার ছেঁড়া নেক্‌ড়া জুটাইতে পারি না—আবার ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা!'' আমি বুঝিলাম, কথাটা বড় অসঙ্গত হইয়াছে। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণশায়ী রুগ্ন কুকুরটিও আমার উপর রাগ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিবার উদ্যোগী—বোধ হইল, যেন সে বলিতেছে,

"এক মুঠা ফেলা ভাত পাই না, আবার উনি বুট পায়ে দিয়া, ঢেঁকির উপর বসিয়া, ঘি ময়দার বাহানা আরম্ভ করিলেন।" একটি রোমশূন্য গৃহমার্জ্জার আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, লেজ উঁচু করিয়া চলিয়া গেল—সেই নীরস রামধনালয়ে ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীতের কথা শুনিয়া, সে আমাকে উপহাস করিয়া গেল সন্দেহ নাই।

আমি রামধনকে বলিলাম, "চারিটি ছেলে—তিনটি মেয়ে! অবার তার উপর দুইটি পুত্রবধূ বাড়িয়াছে?" রামধন হাত যোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে দুইটি পুত্রবধূ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তাহাদের সন্তান সন্ততিও হইয়াছে?"

রামধন বলিল, "আজ্ঞা, একটির দুইটি মেয়ে, একটির একটি ছেলে।"

আমি বলিলাম, "রামধন! শত্রুর মুখে ছাই দিয়া অনেকগুলি পরিবার বাড়িয়াছে। বহু পরিবার বলিয়া তোমার আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।"

রামধন বলিল, "এখন বড় কষ্ট হইয়াছে।"

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামধন! কেন এত পরিবার বাড়াইলে?"

রামধন কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, "সে কি মহাশয়! আমি কি পরিবার বাড়াইলাম? বিধাতা বাড়াইয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "গরিব বিধাতাকে অনর্থক দোষ দিও না। ছেলের বিয়ে তুমি দিয়াছ—সুতরাং তুমিই দুইটি পুত্রবধূ বাড়াইয়াছ। আর ছেলের বিয়ে দিয়েছ বলিয়াই তিনটি নাতি নাতনী বাড়াইয়াছ।"

রামধন কাতর হইয়া বলিল, "মহাশয়, আমাকে অমন করিয়া খুঁড়িবেন না, যমদণ্ডে সে দিন আমার আর একটি নাতি নষ্ট হয়েছে।"

আমি দুঃখপ্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেটি কিসে গেল রামধন!"

রামধন কিছু উত্তর দেয় না। পীড়াপীড়ি করিয়া, কতকগুলি জেরার সওয়াল করিয়া, বাহির করিলাম যে, সেটি অনাহারে মরিয়াছে। মাতা পীড়িত হওয়ায় মাতৃস্তনে দুধ ছিল না। রামধনের গোরু মরিয়া গিয়াছিল—দুধ কিনিবার সাধ্য নাই। ছেলেটি না খাইয়া পেটের পীড়ায় ভুগিয়া[১] মরিয়া গিয়াছিল।

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "তার পর ছোট ছেলেটির বিয়ে দিবে?"

রামধন বলিল, "টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই দিই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যেগুলি জুটিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার না—আবার বাড়াবে কেন? বিয়ে দিলেই ত আপাততঃ বৌমা আসবেন—তাঁর আহার চাই।

১. অনাহারের একটি ফল পেটের পীড়া, ইহা সকলের জানা না থাকিতে পারে।

তারপর তাঁর পেটে দুটি চারিটি হবে—তাদেরও আহার চাই। এখনই কুলায় না—আবার বিয়ে?"

রামধন চটিল। বলিল, "বেটার বিয়ে কে না দেয়? যে খেতে পায়, সেও দেয়, যে না খেতে পায়, সেও দেয়।"

আমি বলিলাম, "যে না খেতে পায়, তার বেটার বিয়েটা কি ভাল?"

রামধন বলিল, "জগৎ শুদ্ধ এই হতেছে।"

আমি বলিলাম, "জগৎ শুদ্ধ নয় রামধন, কেবল এই দেশে। এমন নির্ব্বোধ জাতি আর কোন দেশে নাই।"

রামধন উত্তর করিল, "তা দেশশুদ্ধ লোক যখন করিতেছে, তখন আমাতেই কি এত দোষ হইল?"

এমন নির্ব্বোধকে কিরূপে বুঝাইব? বলিলাম, "রামধন! দেশশুদ্ধ লোক যদি গলায় দড়ি দেয়, তুমিও কি দিবে?"

রামধন চেঁচাইতে আরম্ভ করিল, "তুমি বল কি মশাই? গলায় দড়ি আর বেটার বিয়ে দেওয়া সমান?"

আমিও রাগিলাম, বলিলাম, "সমান কে বলে রামধন! এরূপ বেটার বিয়ে দেওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া অনেক ভাল। আপনার গলায় না পার, ছেলের গলায় দিও।"

এই বলিয়া আমি ঢেঁকি হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়া রাগ পড়িয়া গেলে ভাবিয়া দেখিলাম, গরিব রামধনের অপরাধ কি? বাঙ্গালা শুদ্ধ এইরূপ রামধনে পরিপূর্ণ। এ ত গরিব পোদের ছেলে—বিদ্যা বুদ্ধির কোন এলাকা রাখে না। যাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, তাঁহারাও ঘোরতর রামধন। ঘরে খাবার থাক বা না থাক—আগে ছেলের বিয়ে। শুধু ভাতে ডালের ছিটা দিয়া খাইয়া সাত গোষ্ঠী পোড়া কাঠের আকার—জ্বর প্লীহায় ব্যতিব্যস্ত—তবু সেই কদন্ন খাইবার জন্য—সেই অনাহারের ভাগ লইবার জন্য—সে জ্বর প্লীহার সাথি হইবার জন্য টাকা খরচ করিয়া পরের মেয়ে আনিতে হইবে! মনুষ্যজন্মে তাহাই তাঁহাদের সুখ। যে বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল, তাহার বাঙ্গালীজন্মই বৃথা। কিন্তু ছেলের বিয়ে দিলে, ছেলে বেচারি বউকে খাওয়াইতে পারিবে কি না,-সেটা ভাবিবার কোন প্রয়োজন আছে, এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে ছেলে ইস্কুল ছাড়িতে না ছাড়িতে একটি ক্ষুদ্র পল্টনের বাপ—রশদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ অস্থির। গরিব বিবাহিত তখন স্কুল ছাড়িয়া, পুঁথি পাঁজি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া, উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। যোড় হাত করিয়া ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকরি! হা চাকরি! করিয়া কাতর। হয় ত সে ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত। হয় ত সে সময়ে আপনার পথ চিনিয়া জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে, জীবন সার্থক করিতে

পারিত। কিন্তু পথ চিনিবার আগেই সে সকল ভরসা ফুরাইল, উমেদওয়ারির যন্ত্রণায় আর চাকরির পেষণে—সংসারধর্ম্মের জ্বালায়—অন্তর ও শরীর বিকল হইয়া উঠিল। বিবাহ হইয়াছে—ছেলে হইয়াছে, আর পথ খুঁজিবার অবসর নাই—এখন সেই একমাত্র পথ খোলা—উমেদওয়ারি। আর লোকের উপকার করিবার কোন সম্ভাবনা নাই—কেন না, আপনার স্ত্রী কন্যা পুত্রের উপকার করিতে কুলায় না—তাহারা রাত্রিদিন দেহি দেহি করিতেছে। আর দেশের হিতসাধনের ক্ষমতা নাই, স্ত্রীপুত্রের হিতের জন্য সর্ব্বস্ব পণ! লেখা পড়া, ধর্ম্মচিন্তা—এ সকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই—ছেলের কান্না থামাইতেই দিন যায়। যে টাকাটা পেট্রিয়টিক্ আসোসিয়েসনে চাঁদা দিতে পারিত, ছেলে এখন তাহাতে বধূঠাকুরাণীর বালা গড়াইয়া দিল। অথচ বাঙ্গালার রামধনেরা শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না পারিলে মনে করেন, ছেলেরও সর্ব্বনাশ—নিজেরও সর্ব্বনাশ করিলেন। ছেলে থাকিলেই তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, [illegible] বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান কার্য্য—শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া—এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্ব্বব্যাপী, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে বাপ মা, ছেলে সাঁতার শিখিতে না শিখিতে বধূরূপ পাতর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে ফেলিয়া দেয়, সে দেশের উন্নতি হইবে?

[১২৮৮ ভাদ্র। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

মনুষ্যত্ব কি ?

গুরু। মনুষ্যত্ব বুঝিলে ধর্ম্ম সহজে বুঝিতে পারিবে। তাই আগে মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ। এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বটগাছ দেখিতেছ—দুইটিই কি এক জাতীয় ?

শিষ্য। হাঁ, এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ্।

গুরু। দুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে ?

শিষ্য। না, বটকেই বৃক্ষ বলিব—ওটি তৃণ মাত্র।

গুরু। এ প্রভেদ কেন ?

শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল, এই লইয়া বৃক্ষ। বটের এ সব আছে, ঘাসের এ সব নাই।

গুরু। ঘাসেরও সব আছে—তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত। ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না ?

শিষ্য। ঘাস আবার বৃক্ষ ?

গুরু। যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি পরিণত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত্ত্ব আছে, একজন হটেণ্টট্ বা চিপেবারও সেরূপ মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যে উদ্ভিত্ত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ব মনুষ্যধর্ম্ম, হটেণ্টট্ বা চিপেবার সেই মনুষ্যত্ব নাই। বৃক্ষত্বের উদাহরণ ছাড়িও না, তাহা হইলেই বুঝিবে। ঐ বাঁশঝাড় দেখিতেছ—উহাকে বৃক্ষ বলিবে ?

শিষ্য। বোধ হয় বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা ও পল্লব আছে; কিন্তু কৈ, উহার ফুল ফল হয় না; উহার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি নাই; উহাকে বৃক্ষ বলিব না।

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে এক একবার উহার ফুল হয়। ফুল হইয়া ফল হয়, তাহা চালের মত। চালের মত, তাহাতে ভাতও হয়।

শিষ্য। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব।

গুরু। অথচ বাঁশ তৃণ মাত্র। একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাঁশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ—মিলিবে। উদ্ভিত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃণশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখ, স্ফূর্ত্তিগুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ। অথচ বাঁশের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি নাই। যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।

শিষ্য। এরূপ পরিণতি কি ধর্ম্মের আয়ত্ত?

গুরু। উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল; লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণে বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া বলেন যে, বৃক্ষ আর ঘাস, এই দুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাহিবে?

শিষ্য। বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব।

গুরু। মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলে অন্নাভাবে মারা যাইবে যে? জান না যে, ধানও তৃণজাতীয়? যে ভাঁটুই দেখিতেছ, উহা ভাল করিয়া দেখিয়া আইস। ধানের পাট হইবার পূর্ব্বে ধানও ঐরূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্য জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। গমও ঐরূপ। যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিক্তস্বাদ কদর্য্য উদ্ভিদ্ ছিল—কর্ষণে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই; এজন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম, CULTURE! এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, "The Substance of Religion is Culture." "মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম।"

শিষ্য। তাহা হউক। স্থূল কথাও কিছুই বুঝিতে পারি নাই—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে?

গুরু। অঙ্কুরের পরিণাম, মহামহীরুহ। মাটি খোঁজ, হয়ত একটি অতি ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য, অঙ্কুর দেখিতে পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কুর সেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ—কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই—জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই—বৃক্ষের জাতিবিশেষে মাটিতে সার দেওয়া চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্কুর সুবৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যেরও এইরূপ। যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্ব্বগুণযুক্ত, সর্ব্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্ব্বসুখী সর্ব্বগুণযুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে পারে?

গুরু। কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার। তবে ইহা স্বীকার করিব যে, এ পর্য্যন্ত কেহ কখন হয় নাই। আর সহসা কেহ হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে আমি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত

অবলম্বনে ইহাই হইবে যে, লোকে সর্ব্বগুণ অর্জ্জনের জন্য যত্নে বহুগুণসম্পন্ন হইতে পারিবে; সর্ব্বসুখ লাভের চেষ্টায় বহু সুখ লাভ করিতে পারিবে।

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে, তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ, এক শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে; যথা,—হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়; মস্তিষ্ক, হৃৎ, বায়ুকোষ, অন্ত্র প্রভৃতি জীবনসঞ্চালক প্রত্যঙ্গ; অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শোণিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এ সকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ—

শিষ্য। মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বাহু বয়োগুণে আপনিই বর্দ্ধিত ও বলশালী হইবে। তাহা ছাড়া আবার কি চাই?

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, তাহার দুইটি কারণ। আমিও সেই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছি। সেই দুইটি কারণ—পোষণ ও পরিচালনা। তুমি কোন শিশুর একটি বাহু, কাঁধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে পারে। তাহা হইলে ঐ বাহু আর বাড়িবে না, হয়ত অবশ, নয় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না। আবার, বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে ঐ হাত অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্ত সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা জৈব কার্য্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। ঊর্দ্ধবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত?

শিষ্য। বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহু পরিণতবয়স্ক মানুষের বাহুর বিস্তার, বল ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই হয়। আর কি চাই?

গুরু। তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি তোমার বাহুস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয়াছ যে এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু ঐ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মত একটি "ক" লিখিতে পারিবে না। তুমি যে না ভাবিয়া, না যত্ন করিয়া অবহেলায় যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন, তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা উহার পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর, ভাবিয়া সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিদ্যা বিস্ময়কর অনুশীলন বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিদ্যা ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অনুশীলনফল। দেখ, একটি শব্দ লিখিতে গেলে, মনে কর এই অনুশীলন শব্দ লিখিতে গেলে,—প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি

স্থির করিতে হইবে—বিশ্লেষণে পাইতে হইবে, অ, ন, উ, শ, ঈ, ল, ন। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে। এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক একটি কাগজে আঁকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শীঘ্র লিখিবে যে, তাহাতে বুঝাইবে যে তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছ না। অনুশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী। অনুশীলনজনিত আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুমি যেমন পাঁচ মিনিটে দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাঠা জমিতে কোদালি দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায়, হয়ত দুই প্রহরেও তাহা পারিয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে তোমার বাহু উপযুক্তরূপে চালিত অর্থাৎ অনুশীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত; সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ সুকণ্ঠ নহে। কিন্তু অনুশীলন গুণে গায়ক সুকণ্ঠ হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে। আবার দেখ,—বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ হাঁটিতে পার ?

শিষ্য। আমি বড় হাঁটিতে পারি না ; বড় জোর এক ক্রোশ।

গুরু। তোমার পদদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় নাই। দেখ তোমার হাত, পা, গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে—কিন্তু একেরও সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি না হইলে শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না ; কেন না, ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পূরা টাকাতেই কম্‌তি হয়। যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, যেগুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে। কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জ্জন ও বিচার। কতকগুলির কাজ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়া—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন। এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি।

শিষ্য। অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জ্জুন আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখন এরূপ হইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই।

গুরু। যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও

ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগুণবর্ণনা যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় যে, এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে। ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা, ইহা বুঝে না, সে টাকার মূল্যস্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে।

শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মানুষ ত দেখি না।

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ব্বগুণের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এই জন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে, ধর্ম্ম সম্যক্ ধর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয় না; কেন না, যিনি নির্গুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" চৈতন্য অথবা যাহাকে হর্বর্ট স্পেন্সর "Inscrutable Power in Nature" বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্ম্মের মূল, কেন না, তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে "Impersonal God" বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল; যাঁহাকে "Personal God" বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।

শিষ্য। মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে। কিন্তু উপাসনার প্রয়োজন কি?

গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে সম্ভবনা নাই, কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা। তবে বেগার টালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে;—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার নির্ম্মলতার মত নির্ম্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্ব্বত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য,

সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব,—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

শিষ্য। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোঁটা জল, তাহাতে গিয়া মিশিব।

গুরু। উপাসনা-তত্ত্বের সার মর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে।

শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। মনুষ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়?

গুরু। এই জন্য ধর্ম্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্ম্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউ টেষ্টেমেণ্টের, এবং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ। ধর্ম্মেতিহাসে (Religious History) প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথামাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখৃষ্ট খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্মুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার

শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশ মাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।

শিষ্য। সে কি? কৃষ্ণ!

গুরু। তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন—তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র কীর্ত্তিত আছে, তাহার কিছুই জান না। তাঁহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ব্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের মত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে, বলিয়াছিলেন, "বেদে ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে"—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ।
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।।

[১২৯১ ভাদ্র। *'ধর্ম্মতত্ত্ব'*]

ধর্ম্ম এবং সাহিত্য

আমি প্রচারের একজন লেখক। তাহা জানিয়া প্রচারের এক জন পাঠক আমাকে বলিলেন, ''প্রচারে অত ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না। দুই একটা আমোদের কথা না থাকিলে পড়িতে পারা যায় না।''

আমি বলিলাম, ''কেন, উপন্যাসেও কি তোমার আমোদ নাই? প্রতি সংখ্যায় একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে।''

তিনি বলিলেন, ''ঐ একটু বৈ ত নয়।''

তিন ফর্ম্মা প্রচার, তাহার কখন এক ফর্ম্মা উপন্যাস, কখন বেশী, কখন কম। তাহাও অপ্রচুর! তার পর তিন ফর্ম্মার যেটুকু থাকে, তাহারও কিয়দংশ কবিতা ইত্যাদিতে কতকটা ভরিয়া যায়, ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ এক কোণে এক আধটা পড়িয়া থাকে। তথাপি এই পাঠকের তাহা ভাল লাগে না। বোধ হয়, আরও অনেক পাঠক আছেন, যাঁহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ তিক্ত লাগে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা, ধর্ম্ম কেন তিক্ত লাগে, উপন্যাস রঙ্গরস কেন ভাল লাগে?

আমাদিগের ইচ্ছা, পাঠক! আপনি একটু চিন্তা করিয়া ইহার উত্তর স্থির করেন। আপনা আপনি উত্তর স্থির করিলে তাঁহাদিগের যত উপকার হইবে, কেহ কোন প্রকার শিক্ষা দিয়া সেরূপ উপকার করিতে পারিবে না। তবে আমরা তাঁহাদের কিছু সাহায্য করিতে পারি।

সাধারণ ধর্ম্মশিক্ষকের দ্বারা ধর্ম্ম যে মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা অপ্রীতিকর বটে। এ দেশের আধুনিক ধর্ম্মের আচার্য্যেরা যে হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত করেন, তাহার মূর্ত্তি ভয়ানক। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য, আত্মপীড়ন, ইহাই অধ্যাপক ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট ধর্ম্ম। গ্রীষ্মকালে অতিশয় উত্তপ্ত ও তৃষাপীড়িত হইয়া যদি এক পাত্র বরফজল খাইলাম, তবে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইল! জ্বরবিকারের রুগ্ন শয্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, ডাক্তার আমার প্রাণরক্ষার্থে যদি ঔষধের সঙ্গে আমায় পাঁচ ফোঁটা ব্রাণ্ডী খাওয়াইলেন, তবেই আমার ধর্ম্ম গেল![১] আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্য্যের সে কিছু জানে না, যাহা ষাট বৎসরের বুড়ারও দুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচর্য্যের পীড়নে পীড়িত

১. অনেক হিন্দু এই জন্য ডাক্তারি ঔষধ খান না।

করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম্ম থাকে না। ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্ম্মা, স্বার্থপর, লোভী, কুকর্ম্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপার্জ্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্ত্তি ধর্ম্মের মূর্ত্তি নহে—একটা পৈশাচিক কল্পনা। অথচ আমরা বাল্যকাল হইতে ইহাকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে শুনিয়া আসিতেছি। পাঠক যে ইহাকে পিশাচ বা রাক্ষসের ন্যায় ভয় করিবেন, এবং নাম শুনিবামাত্র পরিত্যাগ করিবেন, ইহা সঙ্গত বটে।

যাঁহারা "শিক্ষিত" অর্থাৎ যাঁহারা ইংরেজি পড়িয়াছেন, তাঁহারা এটাকে ধর্ম্ম বলিয়া মানেন না, কিন্তু তাঁহারা আর এক বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহারা ইংরেজির সঙ্গে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মটাও শিখিয়াছেন। সে জন্য বাইবেল পড়িতে হয় না, বিলাতী সাহিত্য সেই ধর্ম্মে পরিপ্লুত। আমরা খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করি না করি, ধর্ম্ম নাম হইলে সেই ধর্ম্মই মনে করি। কিন্তু সে আর এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিবিশেষ। পরমেশ্বরের নাম হইলে সেই খ্রিষ্টানের পরমেশ্বরকে মনে পড়ে। সে পরমেশ্বর এই পবিত্র নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি বিশ্বসংসারের রাজা বটে, কিন্তু এমন প্রজাপীড়ক অত্যাচারী বিচারশূন্য রাজা কোন নরপিশাচেও হইতে পারে না। তিনি ক্ষণকৃত অতি ক্ষুদ্র অপরাধে মনুষ্যকে অনন্তকালস্থায়ী দণ্ডের বিধান করেন। ছোট বড় সকল পাপেই অনন্ত নরক। নিষ্পাপেরও অনন্ত নরক—যদি সে খ্রিষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করে। যে কখন খ্রিষ্ট নাম শুনে নাই, সুতরাং খ্রিষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা যাহার সাধ্য নহে, তাহারও সেই অপরাধে অনন্ত নরক। যে হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছে, তার সেই হিন্দুজন্ম তাহার দোষ নহে, পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাকে যেখানে প্রেরণ করিয়াছেন, সেইখানেই সে আসিয়াছে, যদি দোষ থাকে, তবে সে পরমেশ্বরের দোষ, তথাপি সে দোষে সে গরিবের অনন্ত নরক। যে খ্রিষ্টের পূর্ব্বে জন্মিয়াছে বলিয়াই খ্রিষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার সে ঈশ্বরকৃত জন্মদোষে তাহারও অনন্ত নরক। এই অত্যাচারকারী বিশ্বেশ্বরের একটি কাজ এই যে, ইনি রাত্রিদিন প্রজাবর্গের মনের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, কে কি পাপসঙ্কল্প করিল। যাহার একটুকু ব্যতিক্রম দেখিলেন, তাহার অদৃষ্টে তখনই অনন্ত নরক বিধান করিলেন। যাহারা এই ধর্ম্মের আবর্ত্তমধ্যে পড়িয়াছে, তাহারা চিরদিন সেই মহাবিষাদের ভয়ে জড়সড় ও জীবন্মৃত হইয়া দিন কাটায়। পৃথিবীর কোন সুখই তাহাদের কাছে আর সুখ নহে। যাঁহারা এই পৈশাচিক ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিতে শিখিয়াছেন, ধর্ম্মের নামে যে তাঁহাদের গায়ে জ্বর আসিবে, ইহা সঙ্গত।

সাধারণ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের এই সকল দোষেই ধর্ম্মালোচনার প্রতি সাধারণ লোকের এত অননুরাগ জন্মিয়াছে। নহিলে ধর্ম্মের সহজ মূর্ত্তি যেরূপ মনোহারিণী, সকল ত্যাগ করিয়া সাধারণ লোকের ধর্ম্মালোচনাতেই অধিক অনুরাগ সম্ভব। আমারও বিশ্বাস যে, জগতে তাহাই হইয়া থাকে; কেবল এখনকার বিকৃতরুচি পাঠকদিগের সম্বন্ধে

এ কথা খাটে না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যেগুলি ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দু খ্রিষ্টিয়ানের দোষে তাঁহাদের নিকট পরিচিত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। ধর্ম্মের মূর্ত্তি বড় মনোহর। ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন—প্রজাপালক। ধর্ম্ম আত্মপীড়ন নহে,—আপনার উন্নতিসাধন, আপনার আনন্দবর্দ্ধনই ধর্ম্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মূর্ত্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে? তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে?

যিনি নাটক নবেল পড়িতে বড় ভালবাসেন, তিনি এক বার মনে বিচার করিয়া দেখিবেন, কিসের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নাটক নবেল পড়েন? যদি সেই সকলে যে বিস্ময়কর ঘটনা আছে, তাহাতেই তাঁহার চিত্তবিনোদন হয়, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? একটি তৃণে বা একটি মাছির পাখায় যত আশ্চর্য্য কৌশল আছে, কোন্ উপন্যাস-লেখকের লেখায় তত কৌশল আছে? আর ইহার অপেক্ষা যাঁহারা উচ্চদরের পাঠক, যাঁহারা কবির সৃষ্ট পদার্থের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না। ধর্ম্মের মোহিনী মূর্ত্তির কাছে সাহিত্যের প্রভাব বড় খাটো হইয়া যায়।

পাঠক বলিবেন, "এ কথা সত্য হইতে পারে না; কেন না, আমার নাটক নবেল পড়িতে ইচ্ছা হয়, পড়িয়াও আনন্দ পাই। কই, ধর্ম্মপ্রবন্ধ পড়িতে ত ইচ্ছা হয় না, পড়িয়াও কোন আনন্দ পাই না।" ইহার উত্তর বড় সহজ। তুমি সাহিত্য পাঠে অনুরক্ত এবং তাহাতে আনন্দ লাভ কর, তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিলে সাহিত্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি চিরকাল সেই সকল বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়াছ, কাজেই তাহাতে আনন্দ লাভ কর। যে সকল বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি সেগুলির অনুশীলন কর নাই, এ জন্য তাহার আলোচনায় তুমি আনন্দলাভ কর না। কিন্তু এখন সেগুলির আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কেন না, তাহাতেই সুখ। সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্ম্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম্ম, সমস্ত ধর্ম্মের তাহা এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্তত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্ম্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে অরোহণ কর।

কিন্তু ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, গোড়ায় কিছু দুঃখ কষ্ট না করিয়া কোন সুখই লাভ করা যায় না। বিলাসী ও পাপিষ্ঠ, যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই সুখ মনে করে, তাহারও উপাদান যত্নে ও কষ্টে আহরণ করিতে হয়। ধর্ম্মালোচনার যে অসীম অনির্বচনীয় আনন্দ, তাহার উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় যে ধর্ম্মমন্দিরের নিম্ন সোপানে যে সকল কঠিন ও কর্কশ তত্ত্বগুলি বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে, সেগুলিকে আগে আপনার আয়ত্ত কর। অতএব আপাততঃ ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ কর্কশ বোধ হইলেও তাহার প্রতি অনাদর করা অনুচিত।

[১২৯১ পৌষ। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছু কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া, তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এ জন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্ত্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

৭। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাশি, জর্ম্মান্ কোটেশন্ বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

৮। অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছু নাই।

৯। যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারি বার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

[১২৯১ মাঘ। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর

(DRAMATIS PERSONAE)

১। উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু।

২। তস্য ভার্য্যা।

উচ্চশিক্ষিত। কি হয়?

ভার্য্যা। পড়ি শুনি।

উচ্চ। কি পড়?

ভার্য্যা। যা পড়িতে জানি। আমি তোমার ইংরাজিও জানি না, ফরাশীও জানি না, ভাগ্যে যা আছে, তাই পড়ি।

উচ্চ। ছাই ভস্ম বাঙ্গালাগুলো পড় কেন? ওর চেয়ে না পড়া ভাল যে।

ভার্য্যা। কেন?

উচ্চ। ওগুলো সব immoral, obscene, filthy.

ভার্য্যা। সে সব কাকে বলে?

উচ্চ। Immoral কাকে বলে জান—এই ইয়ে হয়—অর্থাৎ যা morality-র বিরুদ্ধ।

ভার্য্যা। সেটা কি চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ?

উচ্চ। না না—এই কি জান—ওর আর বাঙ্গালা কোথা পাব? এই যা moral নয়—তাই আর কি।

ভার্য্যা। মরাল কি? রাজহংস?

উচ্চ। ছি ছি! O woman! thy name is stupidity.

ভার্য্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। বাঙ্গালা কথায় ত আর অত বুঝান যায় না—তবে আসল কথাটা এই যে, বাঙ্গালা বই পড়া ভাল নয়।

ভার্য্যা। তা, এই বইখানা নিতান্ত মন্দ নয়—গল্পটা বেশ।

উচ্চ। এক রাজা আর দুয়ো সুয়ো দুই রাণীর গল্প? না নল-দময়ন্তীর গল্প?

ভার্য্যা। তা ছাড়া আর কি গল্প হ'তে নেই?

উচ্চ। তা ছাড়া তোমার বাঙ্গালায় আর কিছু আছে না কি?

ভার্য্যা। এটা তা নয়। এতে কাট্‌লেট্ আছে, ব্রাণ্ডি আছে, বিধবার বিবাহ আছে—বৈষ্ণবীর গীত আছে।

উচ্চ। Exactly. তাই ত বলছিলাম,ও ছাই ভস্মগুলো পড় কেন?

ভার্য্যা। কেন, পড়িলে কি হয়?

উচ্চ। পড়িলে demoralize হয়।

ভার্য্যা। সে আবার কি? ধেমোরাজা হয়?

উচ্চ। এমন পাপও আছে! Demoralize কি না—চরিত্র মন্দ হয়।

ভার্য্যা। স্বামী মহাশয়! আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ডি মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া ও কাজ হয়, তারা এমনই কুচরিত্রের লোক যে, তাদের মুখ দেখিলেও পাপ আছে। আপনার বন্ধুবর্গ ডিনরের পর যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কন—শুনিতে পাইলে খানসামারাও কাণে আঙুল দেয়। আপনি যাদের বাড়ী মুরগি মাটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে, তাহারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্য কোন ভয় নাই,—আর আমি গরিবের মেয়ে, একখানা বাঙ্গালা বই পড়িলেই গোল্লায় যাব?

উচ্চ। আমরা হলেম Brass pot; তোমরা হলে Earthen pot.

ভার্য্যা। অত পট পট কর কেন? কইমাছ ছাঁকা তেলে পড়েছ নাকি? তা যা হোক, একবার এই বইখানা একটু পড় না।

উচ্চ। (শিহরিয়া ও পিছাইয়া) আমি ও সব ছুঁয়ে hand contaminate করি না।

ভার্য্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। ও সব ছুঁয়ে হাত ময়লা করি না।

ভার্য্যা। তোমার হাত ময়লা হবে না, আমি ঝাড়িয়া দিতেছি।

(ইতি পুস্তকখানি আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান। মানসিক ময়লা ভয়ে ভীত উচ্চশিক্ষিতের হস্ত হইতে পুস্তকের ভূমে পতন।)

ভার্য্যা। ও কপাল! আচ্ছা, তুমি যে বইখানাকে অত ঘৃণা করচো, কই—তোমার ইংরেজেরাও তত করে না। ইংরেজেরা নাকি এই বইখানা তরজমা করিয়া পড়িতেছে।

উচ্চ। ক্ষেপেছ?

ভার্য্যা। কেন?

উচ্চ। বাঙ্গালা বই ইংরেজিতে তরজমা? এমন আষাঢ়ে গল্প তোমায় কে শোনায়? বইখানা seditious ত নয়? তা হলে government তরজমা করান সম্ভব। কি বই ওখানা?

ভার্য্যা। বিষবৃক্ষ।

উচ্চ। সে কাকে বলে?

ভার্য্যা। বিষ কাহাকে বলে জান না ? তারই বৃক্ষ।

উচ্চ। বিষ—এক কুড়ি।

ভার্য্যা। তা নয়—আর এক রকমের বিষ আছে জান না ? যা তোমার জ্বালায় আমি একদিন খাব।

উচ্চ। ওহো ! Poison ! Dear me ! তারই গাছ—উপযুক্ত নাম বটে—ফেল ! ফেল !

ভার্য্যা। এখন, গাছের ইংরেজি কি বল দেখি ?

উচ্চ। Tree.

ভার্য্যা। এখন দুটা কথা এক কর দেখি ?

উচ্চ। Poison Tree ! ওহো ! বটে বটে ! Poison Tree বলিয়া একখানি ইংরেজি বইয়ের কথা কাগজে পড়িতেছিলাম বটে। তা সেখানা কি বাঙ্গালা বইয়ের তরজমা ?

ভার্য্যা। তোমার বোধ হয় কি ?

উচ্চ। আমার Idea ছিল যে, Poison Tree একখানা ইংরেজি বই, তারই বাঙ্গালা তরজমা হয়েছে। তা যখন ইংরেজি আছে, তখন আর বাঙ্গালা পড়বো কেন ?

ভার্য্যা। পড়াটা ইংরেজি রকমেই ভাল—তা কেতাব নিয়েই হোক, আর গেলাস নিয়েই হোক। তা তোমাকে ইংরেজি রকমেই পড়িতে দিতেছি। এই বইখানা দেখ দেখি। এখানা ইংরেজির তরজমা—লেখক নিজে বলিয়াছেন।

উচ্চ। ও সব বরং পড়া ভাল। কি ইংরেজি বইয়ের তরজমা—Robinson Crusoe না Watt on the Improvement of the Mind ?

ভার্য্যা। ইংরেজি নাম আমি জানি না। বাঙ্গালা নাম ছায়াময়ী।

উচ্চ। ছায়াময়ী ? সে আবার কি ? দেখি (পুস্তক হস্তে লইয়া) Dante, by Jove.

ভার্য্যা। (টিপি টিপি হাসিয়া) তা ওখানা ভাল বুঝিতে পারি না—পোড়া বাঙ্গালির মেয়ে, ইংরেজির তরজমা বুঝি এত বুদ্ধি ত রাখিনে—ওটা তুমি আমায় বুঝিয়ে দেবে ?

উচ্চ। তার আর আশ্চর্য্য কি ? Dante lived in the fourteenth century. অর্থাৎ তিনি fourteenth centuryতে flourish করেন।

ভার্য্যা। ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করেন ? এত বড় কবি ?

উচ্চ। কি পাপ ! fourteen মানে চৌদ্দ।

ভার্য্যা। চৌদ্দ সুন্দরীকে পালিশ করেন ? তা চোদ্দই হোক, আর পনেরই হোক, সুন্দরীকে আবার পালিশ করা কেন ?

উচ্চ। বলি চোদ্দ সেঞ্চুরীতে বর্তমান ছিলেন।

ভার্য্যা। তিনি চোদ্দ সুন্দরীতে বর্ত্তমান থাকুন আর চোদ্দ শ সুন্দরীতেই বর্ত্তমান থাকুন, বইখানা নিয়ে কথা।

উচ্চ। আগে অথরের লাইফটা জানতে হয়। তিনি Florence নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানে বড় বড় appointment hold করিতেন।

ভার্য্যা। পোর্টম্যান্টো হলদে করিতেন। আমাদের এই কালো পোর্টম্যান্টোটা হলদে হয় না ?

উচ্চ। বলি বড় বড় চাকরি করিতেন। পরে Guelph ও Ghibilline দিগের বিবাদে—

ভার্য্যা। আর হাড় জ্বালিও না। বইখানা একটু বুঝাও না।

উচ্চ। তাই বুঝাইতেছিলাম। অথরের লাইফ না জানিলে বই বুঝিবে কি প্রকারে ?

ভার্য্যা। আমি দুঃখী বাঙ্গালির মেয়ে, আমার অত ঘটায় কাজ কি ? বইখানার মর্ম্মটা বুঝাইয়া দাও না।

উচ্চ। দেখি, বইখানা কি রকম লিখেছে দেখি।

(পরে পুস্তক গ্রহণ করিয়া প্রথম ছত্র পাঠ)

"সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা"

তোমার কাছে অভিধান আছে ?

ভার্য্যা। কেন, কোন্ কথাটা ঠেকিল ?

উচ্চ। গগন কাকে বলে ?

ভার্য্যা। গগন বলে আকাশকে।

উচ্চ। "সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা"—নিবিড় কাকে বলে ?

ভার্য্যা। ও হরি! এই বিদ্যাতে তুমি আমাকে শিখাবে ? নিবিড় বলে ঘনকে। এও জান না ? তোমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে না ?

উচ্চ। কি জান—বাঙ্গলা ফাঙ্গলা ও সব ছোট লোকে পড়ে, ও সবের আমাদের মাঝখানে চলন নেই। ও সব কি আমাদের শোভা পায় ?

ভার্য্যা। কেন, তোমরা কি ?

উচ্চ। আমাদের হলো polished society—ও সব বাজে লোকে লেখে—বাজে লোকে পড়ে—সাহেব লোকের কাছে ও সবের দর নেই—polished societyতে কি ও সব চলে ?

ভার্য্যা। তা মাতৃভাষার উপর পালিশ-ষষ্ঠীর এত রাগ কেন ?

উচ্চ। আরে, মা মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন—তাঁর ভাষার সঙ্গে এখন আর সম্পর্ক কি ?

ভার্য্যা। আমারও ত ঐ ভাষা—আমি ত মরে ছাই হই নাই।

উচ্চ। Yes for thy sake, my jewel, I shall do it—তোমার খাতিরে একখানা বাঙ্গালা বই পড়িব। কিন্তু mind একখানা বৈ আর নয়!

ভার্য্যা। তাই মন্দ কি?

উচ্চ। কিন্তু এই ঘরে দ্বার দিয়ে পড়্‌ব—কেহ না টের পায়।

ভার্য্যা। আচ্ছা তাই।

(বাছিয়া বাছিয়া একখানি অপকৃষ্ট অশ্লীল এবং দুর্নীতিপূর্ণ অথচ সরস পুস্তক স্বামীর হস্তে প্রদান। স্বামীর তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ সমাপন।)

ভার্য্যা। কেমন বই?

উচ্চ। বেড়ে। বাঙ্গালায় যে এমন বই হয়, তা আমি জানিতাম না।

ভার্য্যা। (ঘৃণার সহিত) ছি! এই বুঝি তোমার পালিশ-ষষ্ঠী? তোমার পালিশ-ষষ্ঠীর চেয়ে আমার চাপড়া-ষষ্ঠী, শীতল ষষ্ঠী অনেক ভাল।

[১২৯১ চৈত্র। *'লোকরহস্য'*]

দ্রৌপদী

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

দশ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদী-চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম। অন্যান্য আর্য্যনারী-চরিত্র হইতে দ্রৌপদী-চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহা যথাসাধ্য দেখান গিয়াছিল। কিন্তু দ্রৌপদী চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত্ত্ব, তাহার কোন কথা সে সময়ে বলা হয় নাই। বলিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ হয়, সে কথাটা বলা যাইতে পারে।

সে তত্ত্বটার বহির্বিকাশ বড় দীপ্তিমান্—এক নারীর পঞ্চ স্বামী অথচ তাঁহাকে কুলটা বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। এমন অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য কোথা হইতে হইল ?

আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয়েরা বর্ব্বর জাতি—তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ পদ্ধতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চ পাণ্ডবের একই পত্নী। ইউরোপীয় আচার্য্যবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক আর না থাকুক, এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলা বলিতে বড় মজবুত।

ইউরোপীয়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে আর কিছুই হইতে পারে না ; আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালি তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নূতন নূতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবৃক্ষের তুলনায় উইলো, কি সাইপ্রেস, যেমন গঙ্গা সিন্ধু গোদাবরীর তুলনায় গ্রীক কবিদের প্রিয় পার্ব্বতী নির্ঝরিণী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোপীয় কাব্য সেইরূপ গ্রন্থ। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, গৃহ্যসূত্র, শ্রৌতসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, দর্শন, এই সকলের ভাষ্য, তার টীকা, তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি,

কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, অভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই লিপিবদ্ধ অনুত্তরণীয় প্রাচীন তত্ত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুণাক্ষরে এমন কথা নাই যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একা দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন পণ্ডিত (Fergusson সাহেব) ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না—সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাসুরের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই বলিতেছিলাম—এই সকল পণ্ডিতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবার স্থূল তাৎপর্য্য কি, এ কথার মীমাংসা করিবার আগে বিচার করিতে হয় যে, এ কথাটা আদৌ ঐতিহাসিক, না কেবল কবিকল্পনা মাত্র? সত্য সত্যই দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল, না কবি এইরূপ সাজাইয়াছেন? মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বুঝাইয়াছি। কিন্তু মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই যে উহার সকল কথাই ঐতিহাসিক, ইহা সিদ্ধ হয় না। যাহা স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, তাহা ঐতিহাসিক নহে—এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দ্রৌপদী-চরিত্র প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না—দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত। তা হউক—কিন্তু মৌলিক মহাভারতে যত কথা আছে, সকলই যে ঐতিহাসিক এবং সত্য, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ। যে সময়ে কবিই ইতিহাসবেত্তা, ইতিহাসবেত্তাও কবি, সে সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ। সত্য কথাকে কবির স্বকপোলকল্পিত ব্যাপারে রঞ্জিত করা বিচিত্র নহে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন, ইহা না হয় ঐতিহাসিক বলিয়া স্বীকার করা গেল—তিনি যে পঞ্চ পাণ্ডবের মহিষী, ইহাও কি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

এই দ্রৌপদীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমুদ্র মধ্যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীগণের বহুবিবাহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিধবা হইলে স্ত্রীলোক অন্য বিবাহ করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এক কালে কেহ একাধিক পতির ভার্য্যা ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্যের প্রতি হস্তে ছয়টি করিয়া দুই হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলি আছে; কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্য চক্ষুহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মনুষ্যজাতির হাতের আঙ্গুল বারটি, অথবা মনুষ্য অন্ধ হইয়া জন্মে। তেমনি কেবলি দ্রৌপদীর বহুবিবাহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, পূর্ব্বে আর্য্যনারীগণমধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর মহাভারতেই প্রকাশ যে, এরূপ প্রথা ছিল না; কেন না, দ্রৌপদী সম্বন্ধে এমন অলৌকিক ব্যাপার কেন ঘটিল,

তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মহাভারতকার পূর্ব্বজন্মঘটিত নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদৃশ সমাজে অত্যন্ত লোক-নিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাণ্ডবদিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত রাজবংশে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কবির এমন একটা কথা, তত্ত্ববিশেষকে পরিস্ফুট করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে।

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর ঔরসে পঞ্চ পুত্র ছিল। কাহারও ঔরসে দুইটি, কি তিনটি হইল না। কাহারও ঔরসে কন্যা হইল না। কাহারও ঔরস নিষ্ফল গেল না। সেই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। কেহই বাঁচিয়া রহিল না। সকলেই এক সময়ে অশ্বত্থামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও কোন কার্য্যকারিতা নাই। সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বভ্রুবাহন, কেমন জীবন্ত।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চ বিবাহ গড়া কথাই হইল, যদি দ্রৌপদী একা যুধিষ্ঠিরের ভার্য্যা ছিলেন, তবে কি আর চারি পাণ্ডব অবিবাহিত ছিলেন? ইহার উত্তর কঠিন বটে।

ভীম ও অর্জ্জুনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহা আমরা জানি। কিন্তু নকুল সহদেবের অন্য বিবাহ ছিল, এমন কথা মহাভারতে পাই না। পাই না বলিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাঁহাদের অন্য বিবাহ ছিল না, এমন নহে। মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন পাণ্ডবের অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুনের জীবনী; অন্য দুই পাণ্ডব তাঁহাদের ছায়া মাত্র—কেবল তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া কাজ করে। তাহাদের অন্য বিবাহ থাকিলে সেটা প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার ছাড়িয়াও যাইতে পারেন। কথাটা তাদৃশ মারাত্মক নহে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হওয়ার পক্ষে আমরা উপরে যে আপত্তি দেখাইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর।

এখন, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চবিবাহ কবিরই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে কবি কি অভিপ্রায়ে এমন বিস্ময়করী কল্পনার অনুবর্ত্তী হইলেন? বিশেষ কোন গূঢ় অভিপ্রায় না থাকিলে এমন কুটিল পথে যাইবেন কেন। তাঁহার অভিপ্রায় কি? পাঠক যদি ইংরেজদিগের মত বলেন—"Tut! clear case of polyandry!" তবে সব ফুরাইল। তা যদি না বলেন, তবে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সেই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাস্পদ লোকের একটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিব। কথাটা প্রচারে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র"কে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—

"শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্য শরীর ধারণপূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারতপ্রণয়নের পূর্ব্বকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণে একটি অতিমানুষ

ঐশী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বাসিত হইয়াছিল, তাহাও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই মহাভারত গ্রন্থেও যে সেই বোধের একটি অপূর্ব্ব প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; বস্তুতঃ তাহাই সম্ভবপর। তবে আমাদের বোধ হয়, মহাভারতরচয়িতা কর্ম্মকাণ্ড বেদব্যাখ্যা প্রভৃতি তাঁহার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে অর্জ্জুন এবং ভদ্রাকে আদর্শ নর-নারী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরে অচল ভক্তি এবং তজ্জাত ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল, তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণে একটি বিশেষ ঐশী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে ঐশী শক্তিটি কোন পার্থিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি কর্ত্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। আদি কবি বাল্মীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই—মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং তাহা যত দূর সম্পন্ন হইতে পারে, তত দূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ ঐশী শক্তির নাম 'নির্লিপ্ততা'। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী 'নির্লেপ'।''[১]

এই ''নির্লেপ'' বৈরাগ্য নহে অথবা সাধারণে যাহাকে ''বৈরাগ্য'' বলে, তাহা নহে। আমি ইহার মর্ম্ম যত দূর বুঝি, গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইতেছি।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।।

আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের) বিষয় সকল উপভোগ করিয়া সংযতাত্মা পুরুষ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

অতএব নির্লিপ্তের পক্ষে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের উপভোগ বর্জ্জন নিষ্প্রয়োজন। এবং বর্জ্জনে সংলেপই বুঝায়। বর্জ্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে, ইন্দ্রিয়ে এখন আত্মা লিপ্ত আছে—বর্জ্জন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগশূন্য, যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে বিজিত করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নির্লিপ্ত। তাঁহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও দুঃখের অতীত।

এইরূপ ''নির্লেপ'' বা ''অনাসঙ্গ'' পরিস্ফুট করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন—নির্লিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিক মাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্ত্তী পুরাণকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বরাঙ্গনামধ্যবর্ত্তী করিয়াছেন। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের সাধন প্রণালীতে এত বেশী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর আবির্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রহিল, সেই নির্লিপ্ত। দ্রৌপদীর বহু স্বামীও

১. এডুকেশন গেজেট, ২৮ বৈশাখ ১২৯৩।

এই জন্য। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপিণী। তৎস্বরূপে তাঁহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য। তাই গণিকার ন্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসর্গযুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা। পঞ্চ পতি দ্রৌপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু, এবং ধর্ম্মাচরণের একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ্য। যেমন প্রকৃত ধর্ম্মাত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র—ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট এক মাত্র অভিন্ন উপাস্য, তেমনি পঞ্চ স্বামী অনাসঙ্গযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট এক মাত্র ধর্ম্মাচরণের স্থল। তাঁহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই; তিনি গৃহধর্ম্মে নিষ্কাম, নিশ্চল, নির্লিপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত। ইহাই দ্রৌপদী-চরিত্রে অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য। তবে ঈদৃশ ধর্ম্ম অতিদুঃসাধনীয়। মহাভারতকার মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্বে সেটুকু বুঝাইয়াছেন। তথায় কথিত হইয়াছে যে, দ্রৌপদীর অর্জ্জুনের দিকে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল বলিয়া তিনি সেই পাপফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিলেন না—সর্ব্বাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা হইলেন।

বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায় যে, দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর ঔরসে কেবল এক একটি পুত্র কেন? হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম্ম; গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্ম্ম। পুত্র উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল; না হইলে, ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রয়োজন, এক পুত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্ম্মার্থে নিষ্প্রয়োজনীয়—কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফল মাত্র। কিন্তু দ্রৌপদী ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত; ধর্ম্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, স্বামিগণের সঙ্গে তাঁহার ঐন্দ্রিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। স্বামীর ধর্ম্মার্থ দ্রৌপদী সকল স্বামীর ঔরসে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন; তৎপরে নির্লেপবশতঃ আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য্য।

এই সকল কথার তাৎপর্য্য বোধ করি, কেহই এমন বুঝিবেন না যে, যে স্ত্রীলোক অনাসঙ্গ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়টি মনুষ্যকে স্বামিত্বে বরণ করিবে—তাহা নহিলে ধর্ম্মের সাধন হইবে না। তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে পড়িলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্রৌপদীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমন মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছিল বলিয়া, তিনি সেই মহাপাপকেও ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন।

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, দ্রৌপদী ধর্ম্মবলে অত্যন্ত দৃপ্তা; সে দর্প কখন কখন ধর্ম্মকেও অতিক্রম করে। সেই দর্পের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়জয়ের কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে স্বতন্ত্র কথা।

[১২৯৩ বৈশাখ। *'বিবিধ প্রবন্ধ'*]

কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মতত্ত্ব

যিনি অশ্বত্থামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন, তিনি অর্জ্জুনকে বড় উচ্চ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের অপেক্ষা তাঁহার ধার্ম্মিকতা অনেক বেশী, এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যাহার প্রস্তাবকর্ত্তা কৃষ্ণ, এবং যাহা পরিশেষে ভীম ও যুধিষ্ঠির সম্পাদিত করিলেন, সে মিথ্যা কথা বলিয়া অর্জ্জুন তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; বরং তজ্জন্য যুধিষ্ঠিরকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, তাহাতে অর্জ্জুন অতি মূঢ় ও পাষণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ পাইয়াই সৎপথ অবলম্বন করিতেছেন। বৃত্তান্তটা এই :—

দ্রোণের পর কর্ণ দুর্য্যোধনের সেনাপতি। তাঁহার যুদ্ধে পাণ্ডবসেনা অস্থির। যুধিষ্ঠির নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাঁহাকে এরূপ সন্তাড়িত করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়া শিবিরে লুক্কায়িত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। এদিকে অর্জ্জুন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অর্জ্জুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগিয়া বড় গরম হইলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এই যে, আপনি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে বড় চটিয়া উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন। শেষে বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর।

শুনিয়া অর্জ্জুন তরবারি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তরবারি দিয়া কাহাকে বধ করিবে? অর্জ্জুন বলিলেন, "তুমি অন্যকে গাণ্ডীব[১] শরাসন সমর্পণ কর, এই কথা যিনি আমারে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব, এই আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথা কহিয়াছেন, অতএব আমি এই ধর্ম্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করতঃ নিশ্চিন্ত হইব।"

---

১. পাঠককে বোধ করি বলিতে হইবে না, গাণ্ডীব অর্জ্জুনের ধনুকের নাম। উহা দেবদত্ত, অবিনশ্বর এবং শরাসন মধ্যে ভয়ঙ্কর।

কথাটা মূঢ় ও পাষণ্ডের মত হইল—অর্জ্জুনের মত নহে। একে ত, গাণ্ডীব অন্যকে দাও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মূঢ়তার কাজ। তার পর পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় পাষণ্ডের কাজ। তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে; তাহার বিস্তারিত মীমাংসা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণায় আমি বাধ্য।

কথাটা এই। সত্য পরম ধর্ম্ম। যদি অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ না করেন, তবে তাঁহাকে সত্যচ্যুত হইতে হয়। অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা তাঁহার কর্ত্তব্য কি না। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?"

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা বুঝাইবার পূর্ব্বে, আমরা পাঠককে অনুরোধ করি যে, আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি, সকল পাঠকই একমত হইয়া উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করা অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য নহে। কৃষ্ণও সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিপণ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর দিলেন না। তিনি প্রাচ্যনীতির বশবর্ত্তী হইয়াই এই উত্তর দিলেন। তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে না—বুঝাইতে হইবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ, ইংলণ্ডের নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে সুপণ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি তখন হয়ও নাই; এবং কৃষ্ণ তন্মার্গাবলম্বী হইলে অর্জ্জুনও তাহার কিছুই বুঝিতেন না।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্ত্বের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহার স্থূলমর্ম্ম বলিতেছি—অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

তাঁহার প্রথম কথা "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"। ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে যে, সকল স্থানে অহিংসা ধর্ম্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং গীতাপর্ব্বাধ্যায়ে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার বিপরীত।

যিনি অহিংসাতত্ত্বের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা করিলে অধর্ম্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা ঐশিক নিয়ম। যে জল পান করি, তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র অনুবীক্ষণদৃশ্য জীব উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহুসংখ্যক তাদৃক্ জীব নাসাপথে প্রেরিত করি, প্রতি পদার্পণে সহস্র সহস্রকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগুলিকে রাঁধিয়া খাই। যদি বল, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে

পাপ নাই; আমি তাহার উত্তরে বলি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসা ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক, আমার গৃহে বা আমার শয্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাঘ্র আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য লম্ফনোদ্যত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্ম্মানুমত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারিকৃত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এবং যে রাজপুরুষের উপর বধার্হের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের, দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক্ বা নপোলেয়ন্ পরস্ব ও পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজ্যপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্ম্মতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম্ম।

পক্ষান্তরে, যে পাখিটা আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, ভোজন জন্যই হউক বা খেলার জন্যই হউক, তাহার নিপাত অধর্ম্ম। যে মাছিটি মিষ্টবিন্দুর অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ক্রীড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়া টিপিয়া মারিল, তাহা অধর্ম্ম। যে মৃগ বা যে কুক্কুট তোমার আমার ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরম্ভরী যে তাহাকে বধ করিয়া খায়, সে অধর্ম্ম। আমরা বায়ুপ্রবাহের তলচারী জীব; মৎস্য, জলপ্রবাহের উপরিচর জীব; আমরা যে তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধর্ম্ম।

তবে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে; বরং পরম ধর্ম্ম। এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলাকের ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণিগণের বিশেষবিনাশহেতু এক শ্বাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত্র তাহার উপর "আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, অপ্সরোদিগের অতি মনোরম গীত বাদ্য আরম্ভ হইল, এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল।" ব্যাধের পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারীর হিংসা করিয়াছিল।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এই অর্থে বুঝিতে হইবে। তবে, ধর্ম্ম প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা করিবে না, এ কথায় একটা ভারি গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম প্রয়োজন কি? ধর্ম্ম কি? Inquisition কর্ত্তৃক মনুষ্যবধে ধর্ম্ম প্রয়োজন আছে বলিয়া কোটি কোটি মনুষ্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। ধর্ম্মার্থই St. Bartholomew হত্যাকাণ্ড। ধর্ম্মাচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেদওয়ালাদিগের দ্বারা পৃথিবী নরশোণিতপ্রবাহে পঙ্কিল হইয়াছিল। ধর্ম্মবিস্তারের জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ

মনুষ্যহত্যা করিয়াছিল। বোধ হয়, ধর্ম্মপ্রয়োজন সম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পড়িয়া মনুষ্য যত মনুষ্য নষ্ট করিয়াছে, তত মনুষ্য আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নাই।

অর্জ্জুনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপস্থিত। তিনি মনে করিয়াছেন যে, সত্যরক্ষাধর্ম্মার্থে যুধিষ্ঠিরকে বধ করা কর্ত্তব্য। অতএব কেবল অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথা বলিলে তাঁহার ভ্রান্তির দূরীকরণ হয় না। এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা।

সে দ্বিতীয় কথা এই যে, বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে।[১] ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, অহিংসা ও সত্য, এই দুইয়ের মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহার অর্থ এই :—নানাবিধ পুণ্য কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করা যায়; যথা—দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংসা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে সকলগুলি সমান নহে; ইতরবিশেষ হওয়াই সম্ভব। শৌচের মাহাত্ম্য বা দানের মাহাত্ম্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহা না হয়, যদি তারতম্য থাকে, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার নীচে।

আমরা পাশ্চাত্যের শিষ্য। অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয়া উঠিবেন। পাশ্চাত্যেরা নাকি বলিয়া থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। তা না হয় হইল; সে কথা এখন উঠিতেছে না। এমন কেহই বলিবেন না যে, পাশ্চাত্যদিগের মতে একজন মিথ্যাবাদী একজন হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাপী, অথবা মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাপী। তাঁহারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় দণ্ডবিধিশাস্ত্র তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিষ্যগণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল পাপের তারতম্যের কথা হইতেছে। কোন অধর্ম্মই কোন সময়ে করিতে নাই। নরহত্যাও করিতে নাই, মিথ্যা কথাও বলিতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, যদি এমন অবস্থা কাহারও ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে বরং মিথ্যা কথা বলিবে, তথাপি নরহত্যা করিবে না। যদি এরূপ ধর্ম্মাত্মা নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন যে, বলেন যে, বরং নরহত্যা করিবে, তথাপি মিথ্যা কথা বলিবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে, তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহাতেই থাক, এ নারকী ধর্ম্ম যেন ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয়।

---

১. যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণকথিত এই ধর্ম্মতত্ত্ব সংস্থাপিত হইতেছে, তাহার মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য।

প্রাণিনামবধস্তাত সর্ব্বজ্যায়াম্মতো মম।
অনৃতাং বা বদেদ্বাচং ন তু হিংস্যাৎ কথঞ্চন।।

পাঠক দেখিবেন, অহিংসা পরমধর্ম্ম, এটা কৃষ্ণবাক্যের ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক অনুবাদ—"আমার মতে প্রাণিগণের অহিংসা সর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ।" অর্থগত বিশেষ প্রভেদ নাই বলিয়া "অহিংসা পরমধর্ম্ম" ইতিপরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি।

কৃষ্ণের এই মত। যদি অর্জ্জুন ইহার অনুবর্ত্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ-পাপ হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু অর্জ্জুন বলিতে পারেন, "এ ত গেল তোমার মত। কিন্তু লৌকিক ও প্রচলিত ধর্ম্ম কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহা যদি প্রচলিত ধর্ম্মানুমোদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপাত্মা বলিয়া কলঙ্কিত হইব।" এজন্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়া প্রচলিত ধর্ম্ম যাহা, তাহা বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, "হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্ম্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই বলিয়া বলিলেন,

"সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই।[১] সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।"

এই গেল স্থূলনীতি। তারপর বর্জ্জিত তত্ত্ব বলিতেছেন,

"কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ, ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে।"

কিন্তু কখন কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা ইহার যথাসাধ্য বিচার করিব। তার পর কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্ব্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না।"

এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাদ এখন থাক। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে উল্লিখিতরূপ আছে। উহা একটি শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে ঐ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে। দুইটিই উদ্ধৃত করিতেছি;

১। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
সর্ব্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ॥

২। বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥

এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ; কেবল প্রথম শ্লোকটিতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, এই প্রভেদ। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপনিই উদয় হইবে, একই অর্থবাচক দুইটি শ্লোকের প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তর এই যে, এই দুইটিই অন্যত্র হইতে উদ্ধৃত—Quotation—কৃষ্ণের নিজোক্তি নহে। সংস্কৃতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, অন্যত্র হইতে বচন

১. "ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।" ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "প্রাণিনামবধস্তাত সর্ব্বজ্যায়ান্মতো মম।" এই দুইটি কথা পরস্পরবিরোধী। তাহার কারণ, একটি কৃষ্ণের মত, আর একটি ভীষ্মাদিকথিত প্রচলিত ধর্ম্মনীতি।

ধৃত হয়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরের। এই মহাভারতীয় গীতা-পর্ব্বাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রন্থান্তরে দিয়াছি।

আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, এ বচন দুইটি অন্যত্র হইতে ধৃত। দ্বিতীয় শ্লোকটি, যথা—"বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে" ইত্যাদি—ইহা বশিষ্ঠের বচন। পাঠক বশিষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ শ্লোকে তাহা দেখিবেন ; ইহা মহাভারতের আদিপর্ব্বে, ৩৪১২ শ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥

চারিটি ভিন্ন পাঁচটির কথা এখানে নাই, তথাপি বশিষ্ঠের সেই "পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি" আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়।

প্রথম শ্লোকটির পূর্ব্বগামী শ্লোকের সহিত লিখিতেছি ;

(ক) ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
(খ) যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥
(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
(ঘ) সর্ব্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ॥

এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্ব্ব হইতে একটি (১৩৮৪৪) শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—কৃষ্ণের সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই।

(চ) প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
(ছ) অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ ॥

পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ) (ছ) একই। শব্দগুলিও প্রায় একই। অতএব ইহাও প্রচলিত পুরাতন বচন।

ইহা কৃষ্ণের মত নহে ; নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহা বলিতেছেন না ; ভীষ্মাদির কাছে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন ; নিজের অনুমোদিত হউক বা না হউক, কেন তিনি ইহা অর্জ্জুনকে শুনাইতে বাধ্য, তাহা বলিয়াছি। সুতরাং কৃষ্ণচরিত্রে এ নীতির যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বাকি আছে। আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থাবিশেষে সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয় ; এবং সে সকল স্থানে মিথ্যাই প্রযোক্তব্য। একথা তিনি পরে বলিতেছেন।

প্রথমে বিচার্য্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, এবং সত্য মিথ্যা হয় ? ইহার স্থূল উত্তর এই যে, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, আর যাহা অধর্ম্মের অনুমোদিত, তাহাই মিথ্যা। ধর্ম্মানুমোদিত মিথ্যা নাই ; এবং অধর্ম্মানুমোদিত সত্য নাই। তবে সত্যাসত্য মীমাংসা ধর্ম্মাধর্ম্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে

ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন। কথাগুলাতে গীতার উদারনীতির গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বলিতেছেন,

"ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়।"

ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই। তার পর,

"অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই; এই জন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।"

এই কথাটা লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। যাঁহারা বলেন যে, যাহা দৈবোক্তি, বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক,—তাহাতে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম্ম—তাহার বাহিরে ধর্ম্ম কিছুই নাই—তাঁহারা আজিও বড় বলবান। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম দৈবোক্তিনির্দ্দিষ্ট, অনুমানের বিষয় নহে। এ কথা মনুষ্যজাতির উন্নতির পথে বড় দুরুত্তীর্য্য কণ্টক। আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই মত উন্নতির পথ রোধ করিতেছে। আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। আজিও ভারতবর্ষের ধর্ম্মজ্ঞান বেদ ও মনুযাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতির দ্বারা নিরুদ্ধ;—অনুমানের পথ নিষিদ্ধ। অতি দূরদর্শী মনুষ্যাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ লোকান্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি-প্রাচীন কালেও দেখিয়াছিলেন। এখন হিন্দুসমাজের ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া বিষণ্ণমনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু অনুমানের একটা মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের উপর অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ ধূমবান্ পর্ব্বত বহ্নিমান্ও বটে, তেমনি একটা লক্ষণ চাহি যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, এই কর্ম্মটা ধর্ম্ম বটে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন।

"ধর্ম্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম্মনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম।"

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মের লক্ষণনির্দ্দেশ। কথাটায়, এখনকার Herbert Spencer, Bentham, Mill ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোন প্রকার অমত করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ—বড় Utilitarian রকমের ধর্ম্ম। বড় Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইয়াছি যে, ধর্ম্মতত্ত্ব হিতবাদ হইতে বিযুক্ত করা যায় না; জগদীশ্বরের সার্ব্বভৌতিকত্ব এবং সর্ব্বময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ খ্রীষ্টধর্ম্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম্মে বলে যে, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্ম্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ ধর্ম্মলক্ষণ।

পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য; যাহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে, তাহাই মিথ্যা। অতএব যাহা সর্ব্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা লোকের অহিতকর,

তাহাই মিথ্যা। এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধর্ম্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে; এবং যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহা ধর্ম্মতঃ সত্য হইতে পারে। এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ এবং সত্যও মিথ্যাস্বরূপ হয়।

উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করাই উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ঐরূপ স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়।

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্ব্বেই, কৃষ্ণ, কৌশিকের উপাখ্যান অর্জ্জুনকে শুনাইয়া ভূমিকা করিয়াছিলেন। সে উপাখ্যান এই,

"কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করতঃ সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি তাহা অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপরিবেষ্টিত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।"

এই স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহারা দস্যু; পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্য—নহিলে তাঁহার কোন পাপই নাই। যদি তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বারা পাপাচরণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ঘোরতর মতভেদ। আমাদের প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখন মিথ্যা হয় না, এবং কোন সময়ে মিথ্যা প্রযোক্তব্য নহে। সুতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিতই হইতে পারে। যাঁহারা ইহার নিন্দা করিবেন (আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি না), তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ উত্তর, মৌনাবলম্বন করা উচিত ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—সে বিষয়ে মতভেদ নাই। যদি দস্যুরা মৌনী থাকিতে না দেয়? পীড়নাদির দ্বারা উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌনরক্ষা করা উচিত ছিল। তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে জিজ্ঞাসা এই, ঈদৃশ ধর্ম্ম পৃথিবীতে সাধারণতঃ চলিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইহাতে

সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সূত্র আমাদের মনে পড়িল। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ।"[১] এরূপ ধর্ম্মপ্রচার চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানবজাতির পরম সৌভাগ্য।

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, যদি একান্তই কথা কহিতে হয়,

অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজতঃ।

তাহা হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়া জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি এইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝেন, তাঁহার ধর্ম্মবাদ যথার্থই হউক, অযথার্থই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে।

প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোক্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে, হত্যাকারীর জীবনরক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম্ম। যিনি এরূপ আপত্তি করিবেন, তিনি এই সত্যতত্ত্ব কিছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মনুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নহিলে যে যাহাকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম্ম; এবং তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্যা বলে, সে অধর্ম্ম করে।

কৃষ্ণোক্ত এই সত্যতত্ত্ব নির্দ্দোষ এবং মনুষ্যসাধারণের অবলম্বনীয় কি না, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝাইবার জন্য উহা পরিস্ফুট করিতে আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্যেরা যে কারণে বলেন যে, সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই পরিহার্য্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধর্ম্ম—সত্য যেখানে মনুষ্যের হিতকারী, সেইখানেই ধর্ম্ম, আর যেখানে মনুষ্যের হিতকারী নয়, সেখানে অধর্ম্ম, ইহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন এবং মনুষ্যসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে,—যে লোকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে, সত্য অবলম্বনীয় বা মিথ্যা অবলম্বনীয়, এ কথার মীমাংসা কে করিবে? যে সে মীমাংসা করিবে। যে সে মীমাংসা করিতে বসিলে, মীমাংসা কখন ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি অনেকেরই অতি সামান্য; কাহারও সম্পূর্ণ নহে। বিচারশক্তি অধিকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইন্দ্রিয়ের বেগ, স্নেহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, মোহ ইত্যাদির প্রকোপ। সত্য নিত্যপালনীয়, এরূপ ধর্ম্মব্যবস্থা না থাকিলে, মনুষ্যজাতি সত্যশূন্য হইবারই সম্ভাবনা।

প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে তাহা বুঝিতেন না, এমত নহে। বুঝিয়াই তাঁহারা বিশেষ করিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গৌতম প্রভৃতি ঋষিদিগেরও মতও সেই প্রকার। তাঁহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মানুমত কি না, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নহে। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব পরিস্ফুট করাই

১. প্রথম অধ্যায়, ৯ সূত্র।

আমার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়দিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি ব্যতীত, এই সাধারণ বিধি কার্য্যে পরিণত করা, সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুরূহ। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা নির্দ্দেশ করিলেই লোককে ধর্ম্মানুমত সত্যাচরণ বুঝান যায় না। তিনি তৎপরিবর্ত্তে কি জন্য, এবং কিরূপ অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লঙ্ঘন করা উচিত, তাহাই বলিতেছেন। আমরা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতেছি।

দান, তপ, শৌচ, আর্জব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কার্য্যকে ধর্ম্ম বলা যায়। ইহার সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থাবিশেষে অধর্ম্ম। অনুপযুক্ত প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ম্ম। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিতেছেন, "সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন দাতারও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।" সত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ তাহার যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি এই ;

"যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়।"

ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথা পুনরুক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব এইরূপ। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝা গেল যে,

১। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম্ম।

৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

৪। এইরূপ সত্য সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে প্রযোক্তব্য।

কৃষ্ণভক্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যতত্ত্ব কোথাও কথিত হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি তাহা না পার, তবে ইহাই আদর্শ মনুষ্যোচিত বাক্য বলিয়া স্বীকার কর।

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম, আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে, যে উপধর্ম্মের ভস্মরাশিমধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধর্ম্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাহা অনল্পকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া, অনর্থক সামর্থ্যব্যয় ও নিষ্ফল কালাতিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠানে হিন্দুসমাজ প্রভান্বিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া, শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত—লোকহিত

পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন্ জাতি অধঃপাতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্রিত হইয়া, নমো ভগবতে বাসুদেবায় বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, তদুপবিষ্ট এই লোকহিতাত্মক ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।[১] তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।

[১২৯৯ শ্রাবণ। *'কৃষ্ণচরিত্র'*]

১. বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল—কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না?